দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে কি মুসলিম লীগের শাসন চলছে?

পৃঃ - ১২

এবার রাজনীতিতে টাকার দাপটের সংস্কার দরকার

পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ২ জানুয়ারি ২০১৭।। ১৭ পৌষ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

সহস্রবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিপ্লবী বৈষ্ণবসাধক শ্রীরামানুজাচার্য

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৭ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২ জানুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

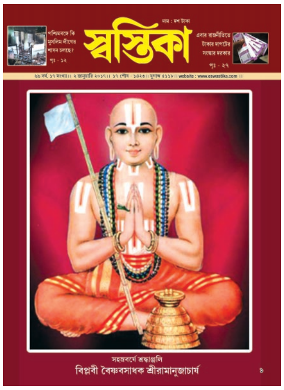

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের নীতি হচ্ছে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে সেই খবর চেপে দেওয়া ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : রাহুল গান্ধীর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশ, পালাবেন কোথায় মোদী? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

পশ্চিমবঙ্গে কি মুসলিম লীগের শাসন চলছে? ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১২

আবির্ভাবের সহস্রবর্ষে নমঃ শ্রীরামানুজাচার্য ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ১৪

বিপ্লবী বৈষ্ণবসাধক রামানুজাচার্য ▯ সুকেশ মণ্ডল ▯ ১৭

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ২১

প্রখ্যাত মনীষীদের ভারতব্যাখ্যান ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ২৩

এবার রাজনীতিতে কালোটাকার দাপটের সংস্কার দরকার ▯ জয় পণ্ডা ▯ ২৭

নোট বাতিলের ধাক্কায় ধরাশায়ী মোদী-বিরোধী রাজনীতি ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ২৯

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ গোটা অঞ্চলের জন্য বিপদ ডেকে আনবে ▯ ৩১

জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত ও বিদ্বানদের সমাগমে লোকমন্থনের অমৃতধারা ▯ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯
শব্দরূপ : ৪০ ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বামী বিবেকানন্দ আশা রাখতেন দেশের যুবসমাজের ওপর। বিশ্বের সর্ববৃহৎ যুবসমাজ ভারতের, প্রায় ৬৫ শতাংশ। যুবসমাজই যে কোনো দেশের মূলধন। ‘জাতীয় যুব দিবসে’র আলোকে যুবসমাজকে নিয়েই লিখেছেন ড. জিষ্ণু বসু, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

নিয়মিত বিভাগ যথারীতি থাকবে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অ-বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে তাঁহারই নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই উস্কানিতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ধারণা হইয়াছে তাহারাই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমতায় বসাইয়াছে। তাই দম্ভ প্রকাশ করিয়া ত্বহা সিদ্দিকি বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে কে ক্ষমতায় বসিবেন তাহা তাঁহারাই ঠিক করিবেন। তৃণমূলদল তথা দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরদহস্ত তাহাদের মাথায় রহিয়াছে। আর তাহারই জন্য তাহারা মালদহের কালিয়াচক, কলিগ্রাম-সহ সারা রাজ্যে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। দুর্গাপূজার সময় হইতে আজ পর্যন্ত ৫০টি দাঙ্গা তাহারা করিয়াছে। ইহারই সাম্প্রতিক সংযোজন হাওড়ার ধুলাগড়ি। কয়েকদিন পূর্বেই কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম নুর রহমান বরকতি দুই তৃণমূল নেতাকে পাশে বসাইয়া ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর ছুড়িয়া মারিয়া ফেলিবার ফতোয়া দিয়াছেন। অভিজ্ঞমহল মনে করিতেছেন ওই ফতোয়া কেবল দিলীপ ঘোষকে নহে, এই রাজ্যের সমগ্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তাহারা নাকি ইংরেজদের মতো দেশ হইতে বিজেপিকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ। এই ক্ষেত্রেও বিজেপির জায়গায় পড়িতে হইবে 'সমগ্র হিন্দুসমাজ'।

ইমাম নুর রহমান বরকতির ওইরূপ ফতোয়ার কয়েকদিন পরই নবির জন্মদিনে ধর্মান্ধরা ধুলাগড়িতে হিন্দুদের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির, দোকানপাট আগুনে ভস্মীভূত করিয়া অবাধে লুঠতরাজ করিয়াছে। মাতৃজাতিকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের তাণ্ডবে যখন ধুলাগড়ি জ্বলিতেছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রলাপ বকিয়া চলিতেছেন। রাজ্য জ্বলিতেছে তবু তিনি হিমশীতল নীরবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। আর ধন্য রাজ্যের সংবাদমাধ্যম! কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাহারাও মৌনব্রত ধারণ করিয়াছে। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ধর্মান্ধ মিছিলকারীরা হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগাইয়া, বোমাবাজি করিয়া, লুঠতরাজ করিয়া ধুলাগড়ি বাজার, শিবতলা, দেওয়ানঘাটা এলাকায় হিন্দুদের সর্বস্বান্ত করিলেও রাজ্যের সংবাদমাধ্যম নীরবতা পালন করিয়াছে। একই ঘটনা ঘটিয়াছে হাওড়ার শিবপুরে। সেখানে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে দুই দলে বচসা শুরু হয়। তারপর হাতাহাতি, শেষে জিহাদি দাঙ্গা। অবস্থা গুরুতর হইয়া ওঠায় র‍্যাফ নামাইতে বাধ্য হয় প্রশাসন। সংবাদমাধ্যম এই ঘটনার সম্বন্ধেও কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্রের শক্তিশালী স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম আজ কাহার ভয়ে ভীত ও আতঙ্কিত? হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে কেন তাহারা সেই খবর চাপিয়া রাখিতেছে? নেট দুনিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া-সহ কয়েকটি সর্বভারতীয় মিডিয়ার দৌলতে সেই খবর কিন্তু গোপন থাকেনি। দেশ তথা রাজ্যের মানুষ তৃণমূলনেত্রী ও রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে।

বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হইল, ধুলাগড়ির জিহাদি তাণ্ডবের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধুলাগড়ির হিন্দুরা তৃণমূলের স্বরূপটিও ধরিয়া ফেলিয়াছে। সেথায় আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয়েই তৃণমূলদলের। ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া শহর সভাপতি দেবাঞ্জল চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'মারিয়াছে তৃণমূল আর মার খাইয়াছে তৃণমূল।' স্বভাবতই ধুলাগড়ি এলাকার হিন্দুরা এখন বিজেপি দলে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে হিন্দুদের জ্ঞানচক্ষু খুলিতেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজ্যটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পড়িয়া দাঙ্গা-রাজ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। রাজ্যের রাজ্যপাল মহোদয় দিকে দিকে দাঙ্গার খবরে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিচলিত হইতেছেন না শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

সুভাষিতম্

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে।। (চাণক্য শ্লোক)

ফলবতী বৃক্ষ নত হয়। গুণবান মানুষও নত হয়। কিন্তু শুকনো কাঠ ও মূর্খব্যক্তি ভেঙে যায়, তবু নত হয় না।

উত্তরবঙ্গ জুড়ে চলছে হিন্দুমেয়ে পাচার

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ সারা রাজ্য যখন শিশুপাচার নিয়ে তোলপাড় তখন উত্তরবঙ্গ জুড়ে চলছে হিন্দুমেয়ে পাচার। তার সঙ্গে ঘটছে বাল্যবিবাহ ও স্কুলছুটের ঘটনা। বনবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে যেমন ব্যাপক মহিলা ও নাবালিকা পাচার হচ্ছে তেমনি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম ও বিদ্যালয়ে প্রশাসনকে আড়াল করে আকছার ঘটছে বাল্যবিবাহ। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় বনবাসী অধ্যুষিত মুণ্ডাপাড়ায় গত দু'বছরে ২০টি নাবালিকা সহ ২৩ জন মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সার্ভে রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরে স্থানীয় প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। একই ভাবে গাজোল, হবিবপুর, বামগোলার সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম থেকেও প্রতিবছর অনেক নাবালিকা নিখোঁজের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই মহিলা এবং নাবালিকারা কীভাবে কোথায় এবং কেন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে তা ওই এলাকার লোকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এইসব পরিবার মোটা টাকা চাকরির লোভে তাদের মেয়েদের স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে সিকিম, ভুটান, বাংলাদেশ, দিল্লি, মুম্বইয়ে কাজের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানতে পারা গেছে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী এলাকার এযাবৎ নিখোঁজ ৭৫০ জনের মধ্যে ২৫০ জন মুণ্ডা সমাজের। তারা সকলেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। গত দু'ই বছরে ২৩ জন বনবাসী মুণ্ডা মহিলা এই গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়েছে যার মধ্যে ২০ জনই নাবালিকা। এইসব পাচার হওয়া মেয়ের বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েদের খোঁজ দিতে পারেনি। মালদা জেলার সাঁওতাল মেয়েরাও গাজোল, হবিবপুর, পুরাতন মালদার বিভিন্ন গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামগুলিতেও সার্ভে করা হলে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসবে বলে অনেকেই মনে করছেন। মালদা জেলার বনবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব রয়েছে। তাদের ছত্রছায়া এবং প্রলোভনেই অনেক মহিলা বাইরে রয়েছে যাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে বাড়ির কোনো যোগাযোগ নেই। উত্তরবঙ্গ জুড়ে নারীপাচার চক্র সক্রিয় থাকায় সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন।

অপরদিকে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে ব্যাপক হারে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীতে পাঠরতা নাবালিকা ছাত্রীদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ইংলিশবাজার, চাঁচল, সুজাপুর, কালিয়াচক, মানিকচক ও রতুয়ার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উঠতে উঠতেই ৩০-৪০ শতাংশ ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রীদের বিয়ে হচ্ছে ৫-১০ শতাংশ। কেন এমন হচ্ছে? দারিদ্র্যই যে এর জন্য দায়ী সে কথা বলা যাবে না। কেননা অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে মৌলবিদের কথা অনুসারে শরিয়াতি প্রথায় ১৩-১৪ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। মালদা শহর থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে কমলাবাড়ি হাইস্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়া ছাত্রীরা হঠাৎ করে তারা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিচ্ছে। সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে এই মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। কিছু বিবাহিতা ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসে কিন্তু তাদের চেনার উপায় নেই (শাঁখা সিঁদুর থাকে না)। ফলে তারা কন্যাশ্রীর প্রকল্পের সুবিধাও ভোগ করছে। বিডিও এবং প্রশাসনকে জানানো হলেও সুফল পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে নাটক ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয় কিন্তু অভিভাবকরা শরিয়তি প্রথার বাইরে আসতে চান না। ফলস্বরূপ অল্পবয়সে মা হয়ে মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে হাসপাতালগুলিতে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। মালদা জেলায় ৫৫ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা হওয়ায় চোরাকারবার, জালনোট-সহ অপরাধমূলক কাজে তাদের সংখ্যা বেশি। ভোট ব্যাঙ্কের জন্য রাজনৈতিক ভাবে তারা লাভান্বিত। ফলে হিন্দুরা এই জেলায় সবদিক থেকে বঞ্চিত। সংখ্যালঘু ভাতা, গৃহঋণ, বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘুদের ছাত্রবৃত্তি-সহ অনেক রকম সুযোগ সুবিধা মুসলমানরা পাচ্ছে। সব মিলিয়ে হিন্দু জনসংখ্যা মালাদা জেলায় ক্রমশ কমছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে মুসলমান জনসংখ্যা এভাবে বাড়লে আগামীদিনে এই জেলার সমস্যা আরও বাড়াবে।

মাওবাদী যোগ, বিহার-ঝাড়খণ্ডে
৬০০ জনধন অ্যাকাউন্ট আয়কর দপ্তরের নজরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহার ও ঝাড়খণ্ডে ৬০০ জনধন অ্যাকাউন্টে মাওবাদী যোগ থাকার সন্দেহে তদন্ত শুরু করলেন আয়কর দপ্তরের কর্তারা। তাদের দাবি, গত ৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করার পর ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে ১০.৮ কোটি টাকা জমা পড়েছে। আয়কর (অপরাধ দমন) বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অশোককুমার সিনহা বলেন, সাধারণত অ্যাকাউন্টগুলিতে ১ থেকে ৩ লক্ষ টাকার বেশি কখনওই জমা রাখা হোত না। কিন্তু নোটবাতিলের পর জমা রাখা টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৮ কোটি টাকা। আয়কর দপ্তরের প্রিন্সিপাল চিফ সেক্রেটারি (বিহার ও ঝাড়খণ্ড) জানান, আরা জেলার একটি জনধন অ্যাকাউন্টে নোটবাতিলের পর৪০ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। আয়কর কমিশনার প্রশান্ত ভূষণ বলেন, তদন্তে যদি ওই ৬০০ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মাওবাদী যোগ প্রমাণিত হয় তাহলে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুটি রাজ্যে আয়কর দপ্তর এখনও পর্যন্ত ১৬টি অভিযান সংগঠিত করেছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকার পরিমাণ ৯ কোটি ১৭ লক্ষ। এছাড়া ধরা পড়েছে ৪২.৪ কোটি টাকার অঘোষিত পায়। সঙ্গে ৭ লক্ষ টাকার গয়নাগাটি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাও।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত হলেও ঈশ্বরের তা পছন্দ নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে এক করে না দেখে 'তিন তালাকের' মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের আচমকা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রথাকে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব আলাদাভাবে বিবেচনা করা দরকার। একই দেশের মধ্যে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই প্রথা অনতিবিলম্বে বাতিল হওয়া উচিত।'' কথাগুলি বললেন প্রবীণ সাংবাদিক-সম্পাদক ও রাজ্যসভার বিজেপি সদস্য এম জে আকবর। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত তিন তালাক নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে বিদেশ দপ্তরের এই উপমন্ত্রী সরাসরি বলেন, '' 'তিন তালাক' নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। একশ্রেণীর ধর্মগুরু প্রচার করছেন তিন তালাক ইসলাম সম্মত। কিন্তু ইসলামের ভিত্তিটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে নারী-পুরুষ লিঙ্গ-বৈষম্য না করে সমতা প্রতিষ্ঠার ওপর। কখনই কোনো নারীর ওপর লিঙ্গভেদে অত্যাচার চালানোর ওপর নয়।'' এই প্রসঙ্গে আকবর বলেন ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে সদাই সমতুল্যতার ওপর জোর দেওয়া হয় অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী উভয়েই সম মর্যাদার

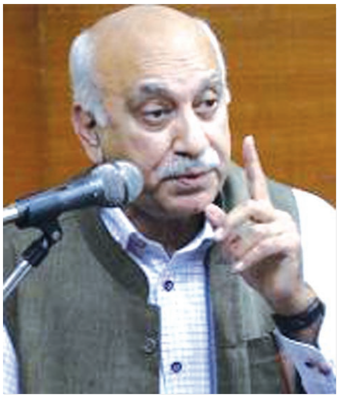

কেউই কম বা বেশি নয়। এটি সমানে সমানে একটি বৈবাহিক চুক্তি, তাই এই চুক্তি ভঙ্গ করার আগে গভীরভাবে চিন্তার প্রয়োজন। কোরানের ৬৫ তম সুরা উদ্ধৃত করে আকবর বলেন, ''যেখানে তালাক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় বলা হয়েছে স্ত্রীদের প্রতি সর্বদাই দয়ালু আচরণ করতে হবে। এই মর্মে বিচ্ছেদ আইনানুগ হলেও তা কখনই ভগবানের পছন্দের নয়।'' তবুও, কিছু ক্ষেত্রে বিবাহ ভেঙে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লে তখনই কিন্তু এই পারস্পরিক সমতুল্যতার বিষয়টি অবশ্য বিচার্য হবে। তিনি জানান তিন তালাক নিয়ে যারা হট্টগোল করছেন তাঁদের ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। তারা ইসলাম বা ন্যায়পরায়ণতার কোনো পরোয়াই করে না। তারা এও জানে না ইসলাম তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে কীভাবে লিঙ্গ ভেদাভেদ নিয়ে সংস্থার প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছিল। কোনো কিছু সম্পর্কে অবগত না থেকে তারা শুধু নারীর ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে চায়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলী বলেন, একশ্রেণীর লোক 'তিন তালাক' বিতর্ককে হাতিয়ার করে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। অন্যদিকে 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানদের গরিষ্ঠাংশের ভোট নিশ্চিত রাখতে তিন তালাক প্রথা কায়েম রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্বের ২২টি দেশ যদি এই প্রথাকে বিলোপ করে দেশ চালাতে পারে সেক্ষেত্রে ভারত কেন পারবে না।

মৌলানা আজাদ কলেজের ধর্মতত্ত্বের প্রবীণ অধ্যাপক আজহর আলম আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, 'নানান মৌলবি সম্প্রতি মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ও তিন তালাক নিয়ে আয়োজিত আলোচনায় অসংখ্য তত্ত্ব ও তথ্য উল্লেখ করলেও কিছুতেই আইনের কোন পথে তিন তালাক বৈধ হবে যে কথা জানাননি।

বক্তব্যের পরিশেষে আয়কর বলেন, এই সংক্রান্ত মামলাটি এখন সর্বোচ্চ আদালতের বিচারাধীন। অজস্র দেশ সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনকে সময়ানুগ করেছে। ভারতেও সেটিই ঘটা উচিত বলে তাঁর অভিমত।

চেক বাউন্স করলে এক মাসের জেল হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার চেক বাউন্সের ক্ষেত্রে চেক প্রদানকারী ব্যক্তিকে আরও কঠোর শাস্তি দেওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রাক্কালে অর্থমন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠনের তরফ থেকে চেক বাউন্সের ক্ষেত্রে শাস্তি আরও কঠোর করার সুপারিশ করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে চেকের ভূমিকা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে চেক বাউন্সের ঘটনাও। বর্তমান আইন অনুযায়ী চেক বাউন্স করলে ব্যাঙ্ক চেক প্রদানকারী ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে জরিমানা বাবদ টাকা কেটে নেয়। ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের দাবি, শাস্তি আরও কঠোর করা হোক। অন্তত এক মাসের জন্য জেলে যেতে হলে এই প্রবণতা কমবে বলে তাঁদের দাবি। আপাতত তাঁদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে এখনই তা বলা না গেলেও অর্থনীতিকে স্বচ্ছ করে তোলার জন্য অর্থমন্ত্রক অনেকদিন ধরেই চেকবাউন্সের শাস্তি আরও কঠোর করার কথা ভাবছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে বিশেষজ্ঞ মহল। আগামী বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই নিয়ে কোনো ঘোষণা করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মেই এবার বিয়ের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। খটকা লাগলেও খবরে প্রকাশ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের তরফে দেশের তুলনামূলকভাবে কম যাত্রী ও ট্রেন যাতায়াত করে এমন বেশ কিছু স্টেশনকে চিহ্নিত করে সেখানে কম খরচে বিবাহ অনুষ্ঠান করানোর কথা বিবেচিত হচ্ছে।

পথের মধ্যে বাঁক নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রেল লাইন, তার পাশেই ছবির মতো ছোট স্টেশনবাড়ি, চারদিকে কৃষিজমির প্রেক্ষাপটে নব-দম্পতির বিবাহ অনুষ্ঠান হওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চের অবকাশ রয়েছে। এই মৌলিক ভাবনাকে মাথায় রেখেই ভারতীয় রেল তার হাতে থাকা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যময় কিছু স্টেশনকে সাতপাকে বাঁধা পড়ার এক যোগ্য স্থান করতে তৎপর হয়েছে।

গত মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'রেল বিকাশ শিবিরের' অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেল কর্তাদের উদ্দেশে কিছু মৌলিক চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে যাতে রেলকে সমৃদ্ধ করা যায় তার অনুরোধ রাখেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মর্মে একটি রোড ম্যাপ তৈরিরও তিনি নির্দেশ দেন।

নড়েচড়ে বসেন রেলকর্তারা। রেলওয়ে বোর্ডের জনৈক উপদেষ্টা অলোক রঞ্জন জানান, দেশের ছোট মাপের স্টেশনগুলিকে বিয়ে উপলক্ষে ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অনান্য অনুষ্ঠানও হতে পারে। বিশেষ করে সেই সমস্ত স্টেশনগুলি যেখানে রাতের দিকে গাড়ি চলাচল কম, সেগুলিকেই চিহ্নিত করা হবে বলে প্রকাশ। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে কম যাত্রী যাতায়াত করা স্টেশনগুলিতে আয় বাড়ানোর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। কমতে পারে লোকসান। রেলের এক কর্তা এই সূত্রে রেলের কেবিনগুলিও বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন। অধিকাংশ স্টেশনগুলি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় একটি যথার্থ গ্রামীণ পরিবেশে বিবাহ অনুষ্ঠানে একটা আলাদা প্রাকৃতিক অনুভূতি পাওয়া যাবে বলে তাঁর অভিমত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রবীণ রেলকর্তা বলেন, এই সূত্রে দেশের ২০০টি এমন স্টেশন রয়েছে যা এই 'থিমের' সঙ্গে খাপ খেয়ে যেতে পারে বলে বিবেচিত হচ্ছে। কেবলমাত্র 'রতলাম' ডিভিশনেই— নউগাঁও, বড়নগর, ধেওধর, রুনিজা ও দেওয়াস-এর মতো পাঁচ-পাঁচটি স্টেশন রয়েছে যেগুলিতে রাতের দিকে কর্মব্যস্ততা খুবই কম বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। স্টেশনগুলি সবই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে ৮০-১৮০ কিলোমিটারের মধ্যে।

চতুর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অগ্নি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিজ্ঞানীদের নেওয়া চতুর্থ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে ভারতের সব থেকে ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি। এরপর সেনাবাহিনীর কিছু রুটিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হলেই আঘাত হানার জন্য তৈরি হয়ে যাবে ক্ষেপণাস্ত্রটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অগ্নির সাফল্য আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালেস্টিক মিসাইল টেকনোলজিতে ভারতকে অনেকদূর এগিয়ে দিল। ভবিষ্যতে অগ্নি ভারতের হয়ে 'গেম চেঞ্জারের' ভূমিকা নেবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। অগ্নির পাল্লা ৫০০০ কিলোমিটার। পাকিস্তান তো বটেই, চীনও এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লার অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিক্করের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা জি. সতীশ রেড্ডি বলেন, 'সফল হওয়ার জন্য অগ্নিকে একের পর এক কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সন্দেহ নেই অগ্নির জন্য দেশের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'দেশকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার কৌশল রচনায় আমাদের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।'

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭ মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

অভিযুক্ত চার ব্যাঙ্ক

ভুয়ো লেনদেনে ১৫০ কোটি কালো থেকে সাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রের নোটবাতিলের সিদ্ধান্তকে সফল করে তোলার জন্য সাধারণ মানুষ যখন কষ্ট করছেন তখন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের অসাধু আধিকারিকদের একাংশের সহযোগিতায় কোটি কোটি কালোটাকা সাদা করে নিচ্ছেন। সম্প্রতি ইডি দক্ষিণ মুম্বইয়ের জাভেরি বাজারের এক সোনার বাট ব্যবসায়ীর হিসাব- বহির্ভূত প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ভুয়ো লেনদেনের মাধ্যমে বৈধ করানোর জন্য চারটি ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। ইডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নোটবাতিলের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই ব্যবসায়ী ১৫০ কোটি টাকা কার্তুজের খোল তৈরি করে এরকম কয়েকটি কারখানার নামে জমা করে দেন। পরে টাকাটা আরটিজিএস-র মাধ্যমে ব্যাবসায়ীর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। ইডির অভিযোগ, বাতিল হওয়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়ার পর ব্যাঙ্কের অভিযুক্ত আধিকারিকেরা কোনো প্রশ্ন করা দূর গুনে পর্যন্ত দেখেননি। এরকম আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে করা হয়েছে বলে ইডির অভিযোগ। টাকা না গুনে নেওয়া এবং গ্রাহকের মুখের কথায় রসিদ দেওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই হিসেবের গরমিল ধরা পড়েছে। অবস্থা সামাল দিতে অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছেন আধিকারিকেরা। যত টাকার গরমিল, ভুয়ো লেনদেনের মাধ্যমে জমা করা মোট টাকা থেকে তা বাদ দিয়ে হিসেব মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব দেখে শুনে ইডির কর্তারা হতবাক হয়ে গেছেন। শুরু হয়েছে জোরদার তদন্ত।

উবাচ

“২০০৮ সালে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হবার পর বিশ্বের কোনো অর্থনীতিই যেখানে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি সেখানে ভারতের অগ্রগতি মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।”

প্রণব মুখোপাধ্যায়
ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

“আগামীদিনে যে সময় আসছে তাতে দেশের সব বেইমান বরবাদ হয়ে যাবে। দেশের ভালোর জন্য স্বচ্ছতার অভিযান কোনো অবস্থাতেই বন্ধ করা হবে না।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কালোটাকার কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

“মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এখন দুটো মাত্র রাস্তা (ক) হয় তিনি সেনাবাহিনীর দেওয়া নথিপত্র জাল প্রমাণ করুন (খ) নয়তো দেশ এবং সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমা চান।”

রবীন্দ্র জাদেজা
ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য

টোলপ্লাজায় সেনার তোলা আদায় প্রসঙ্গে।

“হিজাব পরা এক অবাস্তব অহঙ্কার। ধর্ম বা রুচির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ২৫ বছর আগে ‘হিজাব’ শব্দ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কেউ জানতই না।”

তারিখ ফতেহ্
ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট কানাডিয়ান লেখক

ইদানীং হিজাব নিয়ে মুসলমানদের বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে এক টুইটবার্তায়

“মিসেস সামির পোশাক মোটেই কুরুচিকর বা অশালীন নয়। এই নিয়ে যারা সাদা ছোঁড়াছুড়ি করছেন তারা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন।”

জাভেদ আখতার
কবি ও গীতিকার

ফেসবুকে প্রকাশিত ক্রিকেটার মহম্মদ সামির স্ত্রীর পোশাক প্রসঙ্গ নিয়ে।

রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের নীতি হচ্ছে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে সেই খবর চেপে দেওয়া

গূঢ় পুরুষের কলম

কলকাতার সংবাদমাধ্যম হাওড়ার ধুলাগড়ির সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর পুরোপুরি ‘ব্ল্যাক আউট’ করায় আমি মর্মাহত এবং হতবাক। একটা কথা স্পষ্ট যে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রবল ভয় পাচ্ছে সংবাদমাধ্যমের ব্যবসায়ী পরিচালকরা। গত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের সময় আনন্দবাজার পত্রিকা ও তার সহযোগী টিভি চ্যানেল এবিপি আনন্দ নির্ভয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী সন্ত্রাস মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল। পরে নির্বাচনের ফলাফল তৃণমূলের পক্ষে গেলে নেত্রী প্রত্যাঘাত করেন। কাগজ বাঁচাতে এবং চ্যানেলের সাংবাদিকদের হেনস্থা রুখতে প্রধান সম্পাদক অভীক কুমার সরকারকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মমতার সঙ্গে সন্ধি করেন কর্তৃপক্ষ। অভীকবাবু সংস্থার একজন অংশীদার এবং সরকার পরিবারের বড় ভাই। তবু তাঁকে অসম্মানের সঙ্গে প্রধান সম্পাদক পদ থেকে বিদায় নিতে হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে দেশের ‘সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক’ দাবি করা কলকাতার এই সংবাদপত্রের পরিচালকরা নতজানু হওয়ার ঘটনায় বাংলার তাবৎ সাংবাদিককুল এখন ভীত এবং আতঙ্কিত।

ধুলাগড়ির ঘটনা কিছুটা আমি জানতে পারি ‘হিন্দু এগ্‌জিসটেন্স’ এবং ‘জি নিউজের’ ওয়েবসাইট থেকে। স্বাভাবিকভাবেই এরা মমতার চোখ রাঙানিকে ভয় পায় না। কারণ, এরা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক নয়। আজকের নেট দুনিয়ায় খবর চাপা দেওয়া যে যায় না সে কথা নেত্রীকে বোঝাবে কে? ধুলাগড়ির দাঙ্গার প্রধান মদতদার তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের হাওড়া জেলার নেতারা। এই নেতারাই হাওড়ার বাগনানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উস্কানি দিয়েছিল। পুলিশের কাছে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানানোর পরেও মাইনরিটি সেলের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে ধুলাগড়ির চরম ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু বাসিন্দাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ব্যারিকেড করে ধুলাগড়িতে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সেখানের মানুষ কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন জানা যাচ্ছে না। একদা অনেকটা এই কায়দায় প্রাক্তন বামফ্রন্ট সরকার নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর অবরুদ্ধ করেছিল। পরিণামে বামপন্থীদেরই বাংলা ছেড়ে পালাতে হয়েছে। হাওড়া জেলার মন্ত্রী অরূপ রায় একদল স্তাবক সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে ধুলাগড়ি বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন ক্ষতিগ্রস্তদের চেক বিলি করতে। সেখানে মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই স্তাবক সাংবাদিকরা মার খান। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপোড়া মানুষের বক্তব্য, ‘যখন ধুলাগড় জ্বলছিল তখন এখানে সাংবাদিকদের কাউকে দেখা যায়নি। এখন মন্ত্রীর চেক বিলির খবর প্রচারে এসেছেন। ভাবছেন আমরা গ্রামের মানুষ কিছু বুঝি না। আমরা দিদিকে হিসেব বুঝিয়ে দেব যথাসময়ে।’ সাংবাদিকদের মার খাওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি দুঃখিত নই। ক্ষমতাসীন দলের স্তাবকতা করাটা সাংবাদিকতার নীতি বা ধর্ম নয়। সাংবাদিকতা পেশাটা আর অন্য পাঁচটা পেশার মতো নয়। সাধারণ মানুষের উপর অন্যায় অবিচারের কথা তুলে ধরাটাই সাংবাদিকদের ধর্ম। গরিব চাষির ফসলি জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে সাংবাদিকরাই ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে তার রাজনৈতিক ফায়দা ঘরে তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সুন্দরবনের দুর্গম মরিচঝাঁপিতে জ্যোতি বসুর পুলিশ নির্মমভাবে হত্যালীলা চালিয়েছিল তার খবর সাংবাদিকরাই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশের মানুষকে জানিয়েছিলেন। সাংবাদিকরা তখন মন্ত্রীদের পারিষদ হয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর বা মরিচঝাঁপি যাননি।

মমতা বিমুদ্রাকরণের বিরোধিতা করে বলেছেন দেশজুড়ে এবার দাঙ্গা হবে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের দ্বিতীয় কোনো রাজ্যে দাঙ্গা হয়নি। এই রাজ্যে তৃণমূলের দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় থাকাকালে দক্ষিণবঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে কাটোয়া, রামপুরহাট, বাগনান, সাঁকরাইল এবং ধুলাগড়িতে। উত্তরবঙ্গে মালদার কালিয়াচক ছাড়াও জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে। এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের অলিখিত নীতি হচ্ছে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে সেই খবর চেপে দেওয়া। কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি সাহেব প্রকাশ্যে বলেছেন, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা উচিত। এর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মমতা রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। হাওড়া জেলার বিজেপি ওবিসি মোর্চার সভাপতি তাপস দেবনাথ খুন হন দুষ্কৃতীদের হাতে। পুলিশ নাকি মৃতব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেয়েছে। তাই তাপসবাবু খুন হননি। তিনি পথের ধারে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এই হচ্ছে তৃণমূল রাজত্বের পুলিশ আর তার তদন্ত।

রাহুল গান্ধীর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশ, পালাবেন কোথায় মোদী ?

মাননীয় ‘এপিসেন্টার’ রাহুল গান্ধী
সহ-সভাপতি, কংগ্রেস

আপনাকে ‘এপিসেন্টার’ বললাম বলে রাগ করবেন না প্লিজ। আপনি যেভাবে কিছুদিন যাবৎ খালি ভূমিকম্পের কথা শোনাচ্ছিলেন তাতে আপনাকে ওই নামেই ডাকতে ইচ্ছে করছে। যদিও আপনার বিস্ফোরণে বারুদটাই নেই। হাওয়া ভরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন আপনি। রীতিমতো তথ্য জোগাড় করে তারিখ ধরে ধরে নরেন্দ্র মোদী কবে কোন সংস্থার থেকে কত টাকা নিয়েছিলেন, সেই তথ্য দিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় হাততালি কুড়িয়েছেন। আপনার অভিযোগ ছিল, সহারা এবং বিড়লার থেকে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী।

কিন্তু যে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আপনি এত বড় অভিযোগ আনলেন, তা কতটা গ্রহণযোগ্য? আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া কিছু তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই এমন দাবি করেছেন আপনি। কিন্তু এই তথ্যপ্রমাণগুলিকে মোটেই গুরুত্ব দিতে চায়নি সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। গত ২৫ নভেম্বর মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি জে এস খেহহার এবং অরুণ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশান্ত ভূষণের জমা দেওয়া এই তথ্যপ্রমাণগুলি খারিজ করে আরও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিচারপতি খেহহার মন্তব্য করেন, ‘আপনি সহারার অফিসে পাওয়া তথ্যের উপরে নির্ভর করছেন? এঁরা কখনও সঠিক কাগজপত্র রাখে না।’ শীর্ষ আদালত প্রশান্ত ভূষণকে গত ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আরও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রমাণ জমা দিতে পারেননি প্রশান্ত ভূষণ। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১১ জানুয়ারি।

প্রশ্ন উঠছে, যে তথ্যপ্রমাণকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে শীর্ষ আদালত খারিজ করে দিয়েছে, সেই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করা যায় কি মিস্টার যুবরাজ রাহুল গান্ধী? এই আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধী আপনার নামও নেননি প্রধানমন্ত্রী। বরং ঠাট্টাচ্ছলে আপনাকে ‘একজন যুবনেতা’ বলে ইঙ্গিত করেছেন। মোদী বলেছেন, ‘ওই যে একজন যুবনেতা আছেন...!’ বলেই হাসিতে ফেটে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। তার পরে বলেন, ‘২০০৯-তে জানাই যায়নি এই প্যাকেটে কী ছিল। এখন একটু একটু করে জানা যাচ্ছে। এখন বলতে শিখেছেন। ওঁকে বলতে দেখলে আমার যে কী আনন্দ হয়, বলার মতো না।’ আপনার ‘ভূমিকম্প’-এর হুমকি নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ঘুরিয়ে বলেছেন, রাহুল এখনও কথা বলতেই শেখেননি। ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন, ‘এতদিন এমন মনে হচ্ছিল তিনি মুখ খুললেই ভূমিকম্প হবে। কিন্তু মুখ খোলার পরে বোঝা গেল, আসলে ভূমিকম্পে জোর নেই!’

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে হাসিতে ফেটে পড়েন সভায় উপস্থিত থাকা সাধারণ মানুষ। আপনার অভিযোগের জবাবে প্রধানমন্ত্রী একটা সত্যি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এত বছরের জমানো আবর্জনা সরাতে শুরু করেছি। দুর্গন্ধ তো বেরোবেই। কিন্তু আবর্জনা সরিয়ে আমি বাগান তৈরি করবই। যখন কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছিলাম, তখন ভাবিনি যে আমার দেশের রাজনীতিক নেতারা এভাবে দুর্নীতির কারবারীদের আড়াল করার চেষ্টা করবেন।’

রাহুলবাবু আপনার ‘ভূমিকম্প’ চলতে থাকুক। ভারতীয় রাজনীতিতে হাস্যরস ছড়ানোর কাজে লালু যাদব আর নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় একা হয়ে গিয়েছেন। আপনাকে সঙ্গ দিতেই হবে।

—সুন্দর মৌলিক

পশ্চিমবঙ্গে কি মুসলিম লীগের শাসন চলছে?

প্রবাল চক্রবর্তী

মৃত্যুর লক্ষণ কী? একটা লোক জীবিত কী মৃত, সেটা বুঝবেন কীভাবে? যদি দেখেন, লোকটার বাঁহাতে একরাশ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, অথচ ডানহাত দিব্যি নির্জীব হয়ে পড়ে আছে, তখন ধরে নেওয়া যায়, লোকটা মৃত। আজ শিক্ষিত বাঙালির হাল দেখে তাই মনে হয়।

শনিবারে এক বাঙালির বাড়িতে নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রিত সবাই বাঙালি। কথায় কথায় বলছিলাম, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই দু'মাসে কমপক্ষে পনেরটি জেহাদি দাঙ্গা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। জোর করে দুর্গাপুজো ও কালীপুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বহু জায়গায়। অন্যদিকে বাংলাদেশে পুজোর মরশুমে কোথায় কত হিন্দু নির্যাতন হয়েছে, কোথায় কত বিগ্রহ ভাঙা হয়েছে, তার তো কোনো ইয়ত্তাই নেই। ওই আসরে আমি একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম। আসুন, অস্ট্রেলিয়ার বাঙালি হিন্দুদের নিয়ে একটা সংগঠন তৈরি করি। সেই সংগঠনের মাধ্যমে এপার ওপার দুই বাংলায় যেখানেই যখনি হিন্দুদের ওপর জেহাদি নির্যাতন হবে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রকে আমরা সেকথা লিখে জানাবো। সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাবো। অস্ট্রেলিয়ার আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে এই নিয়ে লাগাতার বৈঠক করব। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনে হইচই তুলব। দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করব। আমার প্রস্তাব শুনে অনেকেই অবাক। আর তাদের প্রতিক্রিয়ায় অবাক হলাম আমি। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন, সেটা তো একটা নিত্যনৈমিত্তিক জলভাত হয়ে গেছে। ও আর নতুন খবর কী, ও নিয়ে ভেবে কী হবে? আর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-নির্যাতন, যাঃ— সে আবার হয় নাকি? কই, খবরের কাগজে তো কখনো এ বিষয়ে কিছু লেখেনি? বস্তুত, আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে যে কারোর মন চাইছে না, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে সবাই মাতলো শাড়ি-জামাকাপড় ও খাওয়াদাওয়ার আলোচনা। ভীষণ বমি পাচ্ছিল তখন। মনে হচ্ছিল, একরাশ গলিত শবদেহের মাঝখানে বসে আছি আমি।

হাওড়ায় যে বিধ্বংসী দাঙ্গা হয়েছে, তার খবর বাজারি বাংলা সংবাদপত্রগুলো চেপে গেলেও সেই দাঙ্গার ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। প্রশ্ন জাগে, এইসব বাজারি সংবাদপত্রগুলো নিজেদের কী ভাবে—ভগবান? কাল্পনিক খবরে পাতা ভর্তি করে চলে এরা, আসল খবর চেপে যায় বেমালুম।

রোববারে সকালে ঘুম থেকে উঠে ফেসবুক খুলতেই আরেকবার গা গুলিয়ে উঠল। ভিডিও ফুটেজে ভিডিও ফুটেজে দেখলাম, মিলাদ-উল-নবির মিছিল থেকে দলে দলে লোক খেলা তরোয়াল হাতে হিন্দুদের বসতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পরনে তাদের বড়দাদার জামার সঙ্গে ছোটোভাইয়ের পায়জামা, মাথায় ফেজটুপি, কণ্ঠে ইসলামের জয়ধ্বনির সঙ্গে হিন্দুদের প্রতি অপসিসীম ঘৃণা। মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়ছে, একের পর এক হিন্দুবসতি জ্বলছে দাউদাউ করে। লুঠ হচ্ছে গরিব মানুষদের জীবনের পুঁজি। নবির জন্মোৎসব হয়ে দাঁড়ালো হিন্দুলুণ্ঠনের মহোৎসবে। বাহারে দিদির রাজত্ব, বাহারে তাঁর প্রিয় ভাইয়েরা! হাওড়ায় যে বিধ্বংসী দাঙ্গা হয়েছে, তার খবর বাজারি বাংলা সংবাদপত্রগুলো চেপে গেলেও সেই দাঙ্গার ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। প্রশ্ন জাগে, এইসব বাজারি সংবাদপত্রগুলো নিজেদের কী ভাবে—ভগবান? কাল্পনিক খবরে পাতা ভর্তি করে চলে এরা, আসল

খবর চেপে যায় বেমালুম। কী ভাবে এরা, এইভাবে সত্যিকে মিথ্যে ও মিথ্যেকে সত্যি বানিয়ে দেওয়া যাবে? বিশেষ করে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে? গুজরাটের দাঙ্গার কথা আজও বাংলার সংবাদপত্রগুলো রসিয়ে রসিয়ে লিখে কলাম ভর্তি করে, এই চোদ্দ বছর পড়েও। রোহিঙ্গাদের প্রতি সমবেদনায় এরা আন্‌সান সু চি-কে পারলে চিবিয়ে জলপান করে ফেলে। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক দাঙ্গা হয়ে চলেছে ফি-বছর, সে খবর বেমালুম চেপে যাচ্ছে! যেদিন সাধারণ মানুষ জানতে পারবে, অমুক খবরের কাগজ জেহাদিদের টাকা খেয়ে বানিয়ে বানিয়ে খবর লিখে বাঙালিকে বোকা বানাচ্ছে, সেদিন থেকে কি আর তারা পকেটের পয়সা খরচ করে ওই খবরের কাগজ কিনবে?

জেহাদি জনগোষ্ঠীর ধারণা হয়েছে, ওরাই মমতাদিকে ভোটে জিতিয়েছে। তাই এবার ওরা সেই উপকারের মাশুল কড়াক্রান্তিতে শোধ করে নেবে। উপর্যুপুরি দাঙ্গা ও জায়গায় জায়গায় দুর্গাপুজো-কালীপুজোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তারই অগ্রদূত মাত্র। গতকাল মালদা, আজ হাওড়া, আগামীকাল কি কলকাতা? এরপরেও কি টালিগঞ্জের শিক্ষিত বাঙালি বাবুরা বলবেন, কিচ্ছুটি হয়নি? কিসের অপেক্ষা করছেন? কবে আপনার পাড়ার পুজোটা বন্ধ হবে? কবে আপনার আত্মজা বিক্রি হবে আরবের দাস-বাজারে? হাওড়ায় যখন দাঙ্গা হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নাকি অকুস্থলে দাঁড়িয়ে লুঠপাট দেখছিল। এক বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণে চোখ বুজে থাকা, তারপর আক্রান্তরা প্রতোরোধ করলেই তাদের গ্রেপ্তার করা, এর নির্দেশ কি নবান্ন থেকে এসেছে? শুনলাম পুলিশের তাড়া খেয়ে হাওড়ার হিন্দু ছেলেরা দলে দলে ঘরছাড়া হচ্ছে। আক্রমণকারীদের না ধরে বেছে বেছে হিন্দু ছেলেদেরই কেস দিচ্ছে পুলিশ। এ তো উনিশশো ছেচল্লিশের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের পরিস্থিতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেদিন মুসলিম লীগের সরকার পুলিশ বাহিনীকে জেহাদের কাজে লাগয়েছিল। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, মুসলমানরা আক্রমণ করলে চোখ বুজে থাকো, আর হিন্দুরা প্রতিরোধ করলেই তাদের আক্রমণ করো, জেলে পুরে দাও। সেদিনের পরিস্থিতি কেমন ছিল, তার একটা আভাস পাওয়া যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদিম রিপু' বইটাতে। আজ সেই পরিস্থিতিরই পুনরাবির্ভাব ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। এই খণ্ডিত বঙ্গেও কি মুসলিম লীগের শাসন চলছে নাকি? যাঁরা ঘাসফুল পার্টির মেরুদণ্ড, সেই বাঙালি হিন্দুরা কী ভাবছেন? আরেকবার যোগেন মণ্ডল হবেন?

বাঙালি বড় ভাবালু জাত। আদর্শ পৃথিবীতে বিশ্বাস করে তারা। যে পৃথিবীতে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি নেই। এই বিশ্বাস বাঙালিকে অনেক সময়েই সিজোফ্রেনিকের পর্যায়ে নিয়ে ফেলে। বাস্তব থেকে চোখ বুজে থেকে কাল্পনিক এক দুনিয়া তৈরি করে সেই দুনিয়ায় কাটিয়ে দেয় সারাজীবন। গান্ধীজীর তিন বাঁদরের আদর্শ উদাহরণ হয়ে ওঠে বাঙালি। ধান্দাবাজ নেতারা এই বাঙালিকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন করেছিল উনিশশো ছেচল্লিশে। ইসলামিক জেহাদকে এক নতুন মোড়কে পরিবেশন করা হয়েছিল সেদিন। অবাক কাণ্ড, বাঙালি চোখ বুজে সে বিষ পান করেছিল বিনা বাক্যব্যয়ে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলায় ছিল মুসলিম লীগের সরকার। পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লীগ যখন রাস্তায় রাস্তায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় নামল, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দুসমাজের তথাকথিত অন্ত্যজরা। আমার শ্বশুরবাড়ি জাতে কায়স্থ। তাঁদের বসবাস সেসময় ছিল নোয়াখালির ফেনী গ্রামে। তাঁদের কাছে শুনেছি, দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষরাই। এতসবের পরেও তফশিলি সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে যোগেন মণ্ডল ঠিক করলেন, হিন্দুভারতে না থেকে মুসলিম পাকিস্তানে যোগ দেবেন। ফল কী হয়েছিল, সে ইতিহাস তো সবারই জানা রয়েছে। যোগেন মণ্ডলকে রাতের আঁধারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার হাজার হাজার তথাকথিত নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দু মেয়েদের অপহরণ করে জাহাজে তুলে দিয়েছিল, আরবের দাস-বাজারে বেচে দিয়েছিল। আজ তারা কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেইসব হতভাগিনীদের কথা পৃথিবীর সঙ্গে বাঙালিও ভুলে গেছে। ভুলে গেছে তাদের বাবা-দাদা-ভাইয়েরাও। তাদের খোঁজ না করে তাদেরই আত্মীয়রা পশ্চিমবাংলায় পালিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে জেহাদি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে ভোটার কার্ড তুলে দিয়েছিল। মরুভূমিতে ঝড়ের লক্ষণ দেখলে উটপাখি বালিতে মুখ গুঁজে ফেলে। ঝড় দেখতে না পেলেই ঝড় আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমনই মনোভাব বাঙালির।

কিন্তু এটাই বাঙালির একমাত্র লক্ষণ নয়। একদিন যখন রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় স্বপ্নের প্রাসাদ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে, সেদিন ভোলা মহেশ্বরের ত্রিনেত্র উন্মীলিত হয়। বাঙালি এককালে ইংরেজ রাজশক্তিকেও বিশ্বাস করেছিল। তারপর যখন বাঙালির মুড় বিগড়ালো, বিশ্বব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্যকে নাস্তানাবুদ করে সে দেশছাড়া করে দিল। জেহাদিদের বলছি, সেদিনের আর দেরি নেই, যেদিন বাঙালি তার ত্রিনয়ন আবার খুলবে। ইংরেজরাই আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে ওঠেনি, তোরা কোথাকার কোনো হরিদাস পাল রে? জেনে রাখ, বাঙালি একা হাতে তোদের মতো আগাছাদের সমূলে উৎপাটিত করে ছিঁড়েখুঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে গঙ্গার জলে হাত ধোবে! তোদের কোনো দিদি ফুপি চাচি ঘেঁচি সেদিন তোদেরকে রক্ষা করতে পারবেন না। বিশ্বব্যাপী জেহাদের স্বপ্ন সেদিন বিশ্বজুড়েই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তার সমাধি রচিত হবে এই বাংলার জলাজঙ্গলে কাদামাটিতে। প্রলয়ের ডম্বরু বাজলো বলে!

(লেখক প্রবাসী বাঙালি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)

আবির্ভাবের সহস্রবর্ষে নমঃ শ্রীরামানুজায়

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

আজ থেকে এক হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীরামানুজাচার্য। আজও তাঁর প্রতিভার জ্যোতিতে আমাদের বেদান্তদর্শন আলোকিত। শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক এক বিখ্যাত সাধক। তাঁর মতো দার্শনিক ও সাধক সমকালে ভারতবর্ষে কেউ ছিলেন না। বেদান্ত দর্শনের আকর গ্রন্থ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের শ্রীভাষ্য' নামে এক নতুন ভাষ্য রচনা করে তিনি তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁর মত ও পথ আজও কোটি-কোটি মানুষকে মুক্তির প্রেরণা দিচ্ছে।

এমন একজন প্রতিভাবান পুরুষের জীবন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনায় পূর্ণ। বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে, বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁর জীবননদী বয়ে গিয়ে শ্রীভগবানের চরণ-সাগরে মিলিত হয়েছে। আজও তাঁর জীবন কাহিনি যে-কোনো কর্মযোগীকে প্রেরণা জোগায়; দিশা দেখায়। তাঁর কঠোর পরিশ্রম, অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা আমাদের আদর্শ।

শ্রীরামানুজ আচার্য ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের শ্রীপেরেম্বুদুর গ্রামে আবির্ভূত হন। এই গ্রাম অতি প্রাচীন ও অশ্বমেধাদি নানাবিধ যজ্ঞের পীঠস্থান ছিল। পিতা কেশবাচার্য দীক্ষিত নিষ্ঠাবান ও সদাচারসম্পন্ন হওয়ায় সর্বদেশে সর্বকালে সম্মানিত হন। কেশবাচার্য অত্যন্ত পণ্ডিত এবং অতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন বলে পণ্ডিতগণ তাঁকে 'সর্বক্রতু' উপাধি দান করেন। শ্রীরামানুজের মাতা ছিলেন শ্রীশৈলপূর্ণ (পেরুয়া তিরুমলাই নম্বি) নামক এক পরম ধার্মিক ব্যক্তির ভগিনী 'কান্তিমতী'।

বিবাহের পর বহুদিন কেশবাচার্যের কোনো সন্তান হয়নি। পরে পার্থসারথির কৃপায় রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজের সংসারজীবনের নাম ছিল লক্ষ্মণ। মাতুল শৈলপূর্ণ শৈশবে তার মধ্যে রামানুজ লক্ষ্মণের সমস্ত লক্ষণ দেখে এমন নামকরণ করেছিলেন। এই সময় কান্তিমতীর ভগিনী মহাদেবীরও একটি পুত্রসন্তান জন্মায়; তার নাম রাখা হয় গোবিন্দ। লক্ষ্মণের পর তাঁর দুই ভগিনী জন্মায়— ভূমি ও কমলা।

রামানুজাচার্যের পিতা কেশবাচার্য ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রামানুজকে বেদ ও অন্যান্য বহুশাস্ত্র পড়ান। যোড়শবর্ষ বয়ঃকালে রামানুজের বিবাহ হয় এবং পিতৃবিয়োগও ঘটে। তখন রামানুজের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁকে পড়াবার মতো পণ্ডিত তাঁর গ্রামের ত্রিসীমানায় কেউ ছিলেন না। কিন্তু রামানুজ থেমে যাবার পাত্র ছিলেন না। সন্ধান করে জানলেন, কাঞ্চীপুরমে অদ্বৈতবেদান্তী শ্রীযাদবপ্রকাশ নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সন্ন্যাসী বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করছেন। তিনি সপরিবারে কাঞ্চীপুরমে এসে মাসতুতো ভাই গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে সেই যাদবপ্রকাশের চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত চর্চার জন্য ভর্তি হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশ রামানুজের প্রতিভায় শুধু বিস্মিত হলেন না; ঈর্ষাব্রহ্ম'— আচার্যমুখে মন্ত্রের ব্যাখ্যা—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ

ও অনন্তস্বরূপ— শুনে রামানুঝ ভাবলেন, তাহলে ভগবানের দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ কোথায় গেল? ভগবান তো গুণী— সকল গুণের আধার। তাই ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন তবে জীব ও ব্রহ্ম তো অভিন্ন হয়ে যায়। আর ব্রহ্ম ও জীব যদি অভিন্ন হয় তবে ভগবানের উপাসনা ও যাজ্ঞযজ্ঞ-পূজার্চনার প্রয়োজন নেই, কারণ এই সব কর্ম মিথ্যা। অথচ উপাসনা ব্যতীত লোকস্থিতি অসম্ভব। ক্ষণকাল পরেই তিনি বললেন— 'গুরুদেব, সৎ চিৎ অনন্ত প্রভৃতি ভগবানের স্বরূপ নয়; গুণ বা ধর্ম।' যাদবপ্রকাশ বহু যুক্তি তর্ক দিয়েও রামানুজের মত খণ্ডন করতে পারলেন না। এরকম আরো দু-বার রামানুজের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে পরাজিত হয়ে তিনি ক্রোধে এবং ঈর্ষায় রামানুজকে অপমান ও তিরস্কার করে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেন। রামানুজ নিজ গৃহে ফিরে এসে নিজে-নিজেই বেদান্তপাঠ করতে লাগলেন। কিন্তু রামানুজকে বিতাড়িত করে যাদব প্রকাশের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তিনি ভাবলেন, এই বালক একদিন অদ্বৈতবাদের মহাশত্রু হবে। একে যেভাবেই হোক হত্যা করতে হবে। তারপর একদিন শিষ্যদের সাহায্যে তিনি রামানুজকে ডেকে পাঠালেন এবং পুনরায় লেখাপড়া শুরু করতে বললেন। সরল স্বভাব রামানুজ আবার তাঁর কাছে লেখাপড়া শুরু করলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ সমস্ত শিষ্য নিয়ে প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। রামানুজও গেলেন। পথে বিন্ধ্যাচলের গোণ্ডারণ্যে রামানুজকে হত্যা করার পরিকল্পনা। তাঁর বিশ্বাসী ও প্রিয় কতিপয় শিষ্যের কাছে তা প্রকাশ করেন। অরণ্যে হত্যা করতে পারলে তার মৃত্যুর দায় বন্য হিংস্র শ্বাপদের উপর দেওয়া সহজ হবে। কিন্তু 'রাখে হরি মারে কে?' এই পরিকল্পনা গোবিন্দ শুনে ফেলে এবং তা রামানুজকে জানিয়ে দেয়। রামানুজ প্রাণের ভয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে ছুটতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে পথ হারিয়ে ফেলেন। তারপর ব্যাধ ও ব্যাধিনীরূপী লক্ষ্মী-নারায়ণের সহায়তায় তিনি একদিনে কাঞ্চীপুরমে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। ফিরে

শ্রীপেরেম্বুদুরে রামানুজস্বামী মন্দির

এসে তিনি মায়ের পরামর্শে বরদ রাজের সেবায় নিযুক্ত হন।

ভগবান বরদরাজের কৃপায় তাঁরই আশীর্বাদধন্য বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধু শ্রীযামুনাচার্যের আহ্বান পান। শ্রীযামুনাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্য পূর্ণাচার্যকে প্রেরণ করলেন রামানুজকে তাঁর সমীপে উপস্থিত করার জন্য। ইতিমধ্যে রামানুজের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। রামানুজ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পূর্ণাচার্যের সঙ্গে চললেন শ্রীযামুনাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মহামিলন ঘটেনি। অসুস্থ যামুনাচার্য দেহরক্ষা করেন। শ্রীযামুনাচার্যের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত বৈষ্ণব রামানুজকে শ্রীযামুনাচার্যের আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযামুনাচার্য তামাম তামিলদেশের বৈষ্ণব পণ্ডিত শিরোমণি ছিলেন। আর ভগবান শ্রীবরদরাজের আদেশে রামানুজ পূর্ণাচার্যকে গুরু নির্বাচন করে তাঁর কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীভগবান বরদারাজ নামকরণ রামানুজ করেছিলেন। শ্রীরামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে একদিন মায়ের আদেশে সেই যাদবপ্রকাশ শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করলেন। মাসতুতো ভাই গোবিন্দাচার্যও শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ এই সময় অতিযত্নে তাঁর দীক্ষাগুরু পূর্ণাচার্যের নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পূর্ণাচার্য শিষ্যের অদ্ভুত প্রতিভা দেখে নিজ পুত্রকে তাঁর শিষ্য করে দেন। পরে অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁকে গোষ্ঠীপূর্ণ নামে এক বৈষ্ণব সাধক ও ধুরন্ধর পণ্ডিতের কাছে প্রেরণ করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীযামুনাচার্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে মন্ত্র দান করলেন। সেই মন্ত্রশক্তিতে রামানুজের হৃদয় আলোড়িত হলো। তাঁর সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়ে গেল। তিনি তখন গোষ্ঠীপুরের সৌম্যনারায়ণের মন্দিরতোরণে উঠে উপস্থিত সকল মানুষকে গোষ্ঠীপূর্ণের মন্ত্রদান করলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ এই সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রামানুজকে ডেকে বললেন— 'দূর হও, নরাধম, তোমাকে এই মন্ত্র মহারত্ন দিয়ে আমি মহাপাপ করেছি। তোমার অনন্ত নরক লাভ হবে!' রামানুজ বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বললেন— 'প্রভো, আপনি বলেছেন— যে এই মন্ত্রলাভ করবে, সে পরমগতি লাভ করবে। যদি আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জীবের

অনন্ত নরক হয়ে এত লোকের মুক্তি হয় তো আমার অনন্ত নরক, অনন্ত বৈকুণ্ঠ স্বরূপ।' গোষ্ঠীপূর্ণ একথা শুনে চমকে উঠলেন, তিনি রামানুজকে আলিঙ্গন করে বললেন—'তুমি ধন্য।' রামানুজের এই ব্যবহারে গোষ্ঠীপূর্ণ এতই সদয় হন যে, নিজের পুত্রকে রামানুজের শিষ্য করে দেন। এইভাবে রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গের কাছ থেকে যামুনাচার্যের নিখিল বিদ্যা লাভ করে বৈষ্ণবসমাজের নেতা হলেন। শ্রীরঙ্গনাথের পাণ্ডারা রামানুজকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়। এইভাবে রামনুজের কীর্তি ও মহত্ত্ব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় যজ্ঞমূর্তি নামে এক অদ্বৈতবেদান্তী মহাপণ্ডিত দিগ্বিজয় করে বেড়াতেন। তিনি রামানুজের কথা শুনেই কাশী থেকে শ্রীরঙ্গমে এলেন রামানুজকে তর্কে পরাস্ত করবেন। অবশেষে নিজেই পরাজিত হয়ে রামানুজের শিষ্যই গ্রহণ করে 'দেরাজ মুনি' নামে পরিচিত হন।

এরপর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য ও ভক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। তখন বহু পণ্ডিত, রাজা, রাজন্যবর্গ এবং অগণিত আপামর সাধারণ ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করে ধন্য হয়। এই সময় বহু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মালম্বী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইভাবে বহু মানুষের মুক্তির উপায় করে দিয়ে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন বলে মনস্থ করেন। তখন শিষ্যদের অনুরোধে তিনি চারদিন মাত্র এই ধরাধামে থাকতে রাজি হন। আর সেই সুযোগে শিষ্যরা তাঁর অন্তিম উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে যান। উপদেশ শেষে তিনি মাসতুতো ভাই গোবিন্দের কোলে মাথা রেখে এবং প্রিয়শিষ্য আন্ত্রপূর্ণের কোলে চরণদ্বয় স্থাপন করে পরমগতি লাভ করেন। অন্তরীক্ষ থেকে 'ধর্মনষ্ট' ধ্বনি উত্থিত হলো। এক মহামানবের লীলা সমাপ্ত হলো। সর্বভূতে দয়া ও সমতাই শ্রীরামানুজের জীবনের মূল কথা। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। আদ্বিজ চণ্ডাল তাঁর প্রিয় ছিল।

তাঁর মতবাদ কোটি কোটি মানুষকে এখনও মুক্তির সন্ধান দিচ্ছে। আগেই বলেছি শ্রীরামানুজ বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত দর্শনের আকর গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রচার করেন। আক্ষরিক অর্থে বেদান্ত হলো বেদের অন্তভাগ— উপনিষদ। প্রচলিত অর্থে এটি একটি দার্শনিক মতবাদ; যে মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্রহ্মবাদ বা চৈতন্যবাদ। বেদান্ত দর্শনের বহু সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায় উপনিষদ ও বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রকে আকর গ্রন্থ রূপে স্বীকার করে— 'বেদান্ত নাম উপনিষদ প্রমাণস্ তদুপকারিণী শারীরিক সূত্রাদিনিচ।' তবে ব্রহ্মসূত্র (শারীরিকসূত্র) বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থ। তাই সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করে নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপনিষদের মধ্যে দুই প্রকার ব্রহ্মবাদ দেখা যায়— সপ্রপঞ্চবাদ অর্থাৎ জগতকে মিথ্যা ও ব্রহ্মকে সত্যরূপে প্রতিপাদন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্রহ্ম-পরিণামবাদ আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্রহ্ম- বিবর্তবাদ। ব্রহ্মসূত্রের বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ প্রথম পক্ষ অর্থাৎ সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদী আর আচার্য শঙ্কর হলেন নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ। যাইহোক, ব্রহ্মসূত্রের বৈষ্ণব ভাষ্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ ও বলদেব। রামানুজের প্রতিপাদ্য বিশিষ্টাদ্বৈবাদ। মধ্বের প্রতিপাদ্য দ্বৈতবাদ। নিম্বার্কের প্রতিপাদ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। বল্লভের প্রতিপাদ্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। আর গোড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রতিপাদ্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।

রামানুজ প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বর বিশেষ্য। তাঁর বিশেষণ হলো জীব ও জগৎ। যেহেতু ঈশ্বর সত্য, সেহেতু জগৎ মিথ্যা নয়, সেটিও সত্য। কারণ বিশেষণ বিশেষ্যকে আশ্রয় করে থাকে। ঈশ্বর ও জীবের, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার্য। তবে ভেদের চেয়ে অভেদের গুরুত্বই বেশি। রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করেছেন। শঙ্করের ন্যায় রামানুজ অদ্বৈতবাদী হলেও রামানুজ মতে ব্রহ্ম একমাত্র চরমতত্ত্ব হলেও নির্গুণ-নির্বিশেষ ও স্বাগতভেদ-রহিত নন। তিনি ঈর্ষাদ্বেষাদি হেয়গুণবর্জিত হওয়ায় উপনিষদে তাঁকে নির্গুণ বলা হয়েছে। বস্তুত, তিনি সর্বশক্তিমত্তা, সর্ববজ্ঞতু, করুণাময়ত্ব প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণের আধার। ব্রহ্মের বিস্ময়কারী সৃষ্টিশক্তির নাম মায়া। ব্রহ্ম নির্বিশেষ সত্তামাত্র নন। তিনি গুণ দ্বারা বিশেষিত। ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার্য নয়। কারণ যিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, এক ও অদ্বিতীয় তাঁর সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ থাকবে কীভাবে? কিন্তু ব্রহ্মের স্বগতভেদ, স্বীকার্য, কারণ তাঁর মধ্যেই পরস্পর ভিন্ন চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ) পদার্থময় বিদ্যমান। এই দুটিই ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মের ন্যায় সত্য। এরা প্রলয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং সৃষ্টিকালে স্থূল জীব ও জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়। ব্যষ্টি দৃষ্টিতে বৃক্ষের মূল-কাণ্ডাদি যেমন বৃক্ষ থেকে ভিন্ন, আবার সমষ্টি দৃষ্টিতে তারা যেমন বৃক্ষ থেকে অভিন্ন, তেমন জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অর্থ বলেই ব্রহ্ম থেকে ভিন্নধর্মী হলেও ব্রহ্মাশ্রেণী ও পৃথক সত্তাহীন বলে ব্রহ্ম থেকে অভিন্নও বটে। এই মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কারণ, এই মতে চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মই একমাত্র চরম তত্ত্ব। এই মতে, মুক্তিকালেও ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্য সম্ভব হয় না। আর ভক্তিদ্বারা প্রাপ্ত ভগবৎ প্রসাদই মুক্তির কারণ।

রামানুজ শুধুই যে, শ্রীভাষ্য রচনা করেছেন তা নয়; তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেইসব গ্রন্থ দর্শন ও ভক্তিবাদ বিষয়ক। আজ সহস্র বৎসর পরেও রামানুজ অনায়াসে বলতে পারেন—

আজি হ'তে সহস্রবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার শ্রীভাষ্যখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হ'তে সহস্রবর্ষ পরে!

শ্রীরামানুজ আজও দর্শনশাস্ত্রের এক প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিত্ব। যতদিন জগতে বেদান্তদর্শন থাকবে ততদিন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও থাকবে। আর মানুষ অনন্ত কৌতূহলভরে তাঁর মতবাদ সমন্বিত শ্রীভাষ্য পাঠ করে অপার আনন্দ লাভ করবে। আর দর্শনের মূল প্রশ্ন ব্রহ্ম-জীব- জগতের সম্পর্ক অন্বেষণ করে মুক্তির সন্ধান করবে। ■

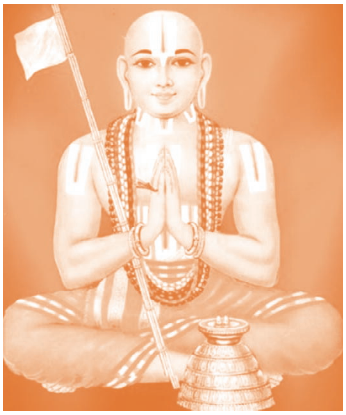

বিপ্লবী বৈষ্ণব সাধক রামানুজাচার্য

সুকেশ মণ্ডল

বৌদ্ধ ও শাঙ্করযুগের পর এক মহা ভক্তিবাদী আচার্যরূপে রামানুজ আবির্ভূত হন। ভগবৎ প্রেম ও দাস্যভাবের পরমতত্ত্ব তিনি মানুষের কাছে সহজভাবে তুলে ধরেন। অসাধারণ জ্ঞান ও সাধন বলে স্থাপন করেন নিজস্ব ভক্তিতত্ত্ব। তাঁর ভক্তি আন্দোলনেই পরবর্তীকালে প্রভাবিত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

অতি বৃদ্ধ এক মহাতপস্বী প্রতিদিন নদীতে স্নান করতে আসেন। বয়সের জন্য কারও কাঁধে ভর দিয়েই চলাফেরা করতে হয়। স্নান করতে আসার সময় এক ব্রাহ্মণ শিষ্যের কাঁধে ও ফেরার সময় তথাকথিত অস্পৃশ্য কোনো শিষ্যের কাঁধে ভর দিয়ে ফেরেন। এ নিত্যদিনের দৃশ্য। একদিন কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে বসলেন— প্রভু, একী আপনার আচরণ? অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন— ‘‘আমি শরীর ও মন দুইকেই স্নান করাই। ব্রাহ্মণের কাঁধে ভর দিয়ে এসে স্নান করলে আমার শরীর পবিত্র হয় কিন্তু মন শুদ্ধ হয় না। তাই ফেরার সময় অবহেলিত ও বঞ্চিত কোনো শিষ্যকে স্পর্শ করলে আমার মন পবিত্র ও শুদ্ধ হয়।’ তারপর সবাইকে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন— ‘জানো, জাত্যভিমানের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর নেই।’

আজ থেকে হাজার বছর আগে জাতপাত ও ছোঁয়াছুতের কানাগলিতে পথ হারিয়ে ভারতীয় সমাজ যখন দিশেহারা, সমাজপতিদের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে যিনি সমাজে সমরসতা স্থাপন করে দাক্ষিণাত্যে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন, তিনি মহাবিপ্লবী বৈষ্ণব সাধক আচার্য রামানুজ। তাঁরই শিষ্য রামানন্দ, যাঁর শিষ্য ছিলেন ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের দুই মহাপুরুষ কবির ও সুরদাস।

বৌদ্ধ ও শাঙ্করযুগের পর এক মহা ভক্তিবাদী আচার্যরূপে রামানুজ আবির্ভূত হন। ভগবৎ প্রেম ও দাস্যভাবের পরমতত্ত্ব তিনি মানুষের কাছে সহজভাবে তুলে ধরেন। অসাধারণ জ্ঞান ও সাধন বলে স্থাপন করেন নিজস্ব ভক্তিতত্ত্ব। তাঁর ভক্তি আন্দোলনেই পরবর্তীকালে প্রভাবিত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, সারা ভারতের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আনে এক নতুন উৎসাহ।

রামানুজের জন্ম ইংরেজি ১০১৭ সালের চৈত্র শুক্ল পঞ্চমীতে চেন্নাই থেকে ত্রিশ মাইল দূরে শ্রী পেরেম্বুদুর নামক স্থানে। পিতা কেশবাচার্য এবং মাতা কান্তিময়ী। কথিত আছে, তাঁর জন্ম শেষনাগের আশীর্বাদে হয়। এজন্য তাঁর নাম শেষাবতার লক্ষ্মণ অর্থাৎ রামানুজ রাখা হয়। তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী প্রকৃতির ছিলেন। তাই শিক্ষকের দোষ ত্রুটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ধরিয়ে দিতেন। এজন্য তাঁকে গুরুর রোষানলে পড়ে অনেক ক্লেশ ভোগ করতে হয়। তিনি মনে করতেন আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের প্রভাবে সমাজে পতন সূচিত হয়েছে। মানুষ ব্রহ্মকেই সত্য এবং পৃথিবী মিথ্যা মনে করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করতে শুরু করে। তাই তিনি মানুষকে আহ্বান করে বললেন, ব্রহ্ম যেমন সত্য, তেমনি জগৎও সত্য। জগৎ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। তাই একে অবহেলা করে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে গেলে চলবে না। তাঁর এই দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈত নামে পরিচিত। তিনি মানুষকে জানালেন, ‘ভগবৎ সেবার থেকে বড় ভাগবত সেবা’। অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ। তাই মানুষ হলো ভাগবত। তাই ভাগবতের সেবায় ভগবান প্রসন্ন হন। সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য ‘নর সেবাই নারায়ণ সেবা’ এই মহামন্ত্রের ঘোষণা তিনিই করেন।

সমাজের হিতসাধন তাঁর জীবনের ধ্যেয় ছিল। তাঁর গুরু আচার্য গোষ্ঠীপূর্ণ বহু কঠোর পরীক্ষার পর তাঁকে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষাদান করেন এবং বলেন, ‘এ মন্ত্র বড় জাগ্রত। এর মাহাত্ম্য খুব কম লোক জানে। সচেতনভাবে যে কেউ এই মন্ত্র জপ করলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হবে। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া এ মন্ত্র কাউকে দান করা যাবে না।’ মন্ত্র গ্রহণের পরেই রামানুজ মন্দিরের গোপুরমে দাঁড়িয়ে চিৎকার এ মন্ত্র সবাইকে শোনাতে লাগলেন। তিনি মনে করতেন, এরূপ কল্যাণকারী মন্ত্রে সবার কল্যাণ হওয়া প্রয়োজন। গুরুদেব তাঁকে নরকে যাবার অভিশাপ দিলে তিনি সবিনয়ে জানান, একজনের নরকে যাওয়ার কারণে যদি বহু লোকের কল্যাণ হয় তাতে তিনি রাজি।

বস্তুত, ভারতবর্ষে ভক্তি আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ রামানুজাচার্য। তিনি গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের ওপর যুগানুকূল ভাষ্য রচনা করেন। সমাজে ব্যাপ্ত কুপ্রথার মূলে

কুঠারাঘাত করেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধঃপতিত সমাজে চেতনা নির্মাণ ও সামাজিক সমতা স্থাপন।

প্রকৃত পরম বৈষ্ণবের মতো তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। কর্ণাটকের মেলকোটার মন্দির থেকে মুসলমান আক্রমণকারীরা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি জোর করে দিল্লী নিয়ে যায়। রামানুজাচার্য একথা শোনার পর কয়েক লক্ষ বৈষ্ণব ভক্ত নিয়ে গিয়ে দিল্লী থেকে কৃষ্ণমূর্তি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। কথিত আছে যে ক'দিন কৃষ্ণমূর্তি মুসলমান শাসকের ঘরে ছিল সেখানে সম্রাট কন্যা ভক্তিভরে পূজা করতো। কৃষ্ণমূর্তি উদ্ধার করে নিয়ে আসার সময় সেই মুসলমান কন্যাও মেলকোটায় এসে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিভাবের জন্য রামানুজাচার্য সেই কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে পূজার ভার অর্পণ করেন। তৎকালীন যুগে রামানুজাচার্যের এই পদক্ষেপ এক বিপ্লবস্বরূপ বলা চলে। এ ঘটনার পাঁচশো বছর পর নবদ্বীপে মহাপ্রভুর 'কাজি দমন' প্রকৃত বৈষ্ণব পরম্পরারই একটি সূত্রমাত্র।

কর্ণাটকের মেলকোটায় রামানুজাচার্যের জীবিতাবস্থায় এক বিশাল মন্দির নির্মিত হয়। সেই মন্দিরে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোক প্রবেশ করতে পারেন। সমস্ত শ্রেণীর বিদ্যার্থী সুলভে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারেন। তিনি জীবৎকালেই দক্ষিণভারতের তথাকথিত অবহেলিত তিরুক্কুলেতর সমাজের লোকদের 'নিত্য বৈষ্ণব' ঘোষণা করে সম্মানের আসনে স্থাপন করেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজের ১২ জন আলবার অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধককে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেন। তিনি দক্ষিণী সমাজের সামনে এক নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করেন— 'ন জাতিঃ কারণে লোকে গুণাঃ কল্যাণ হেতবঃ' অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের কারণ তার জাতির জন্য নয়, গুণই হতে পারে। ব্রহ্মসূত্রের ওপর তাঁর ভাষ্য 'শ্রীভাষ্য' ও 'বেদার্থ সংগ্রহ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থরূপে ভারতের সাধক সমাজের কাছে সমাদৃত।

১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই মহাসাধক ইহলীলা সংবরণ করেন। দীর্ঘ একশো বিশ বছর আয়ুষ্কালে তিনি দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল বৈষ্ণব সাধকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁরই প্রচারিত ভক্তি আন্দোলন পরবর্তীকালে প্রভাবিত করে মাধব, নিম্বার্ক, বল্লভ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ আচার্যকে। এঁদেরই তপোপ্রভাবে আজও ভারত জাগ্রত রয়েছে।

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

চিঠিপত্র

ভিউ ফাইন্ডারে একটি মুখ

স্বদেশবাসীর অধরা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ২০১৪ সালে দিল্লির লালকেল্লায় শপথবাক্য পাঠ করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। দেশবাসীকে তিনি এক নতুন স্বপ্ন দেখালেন।

আকাশে উড়ল মুক্তির পতাকা, যেন প্রকৃত স্বাধীনতা দেশ সেদিন পেল। শুরু হলো একের পর এক মহা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

প্লাস্টিক ও নোংরায় ঢেকে থাকা দেশ শুদ্ধ হলো তার 'স্বচ্ছ ভারত' কর্মসূচিতে। পরিচ্ছন্নতা হলো ঈশ্বরের রূপ, তা সকল মানবজাতির একান্ত প্রয়োজন। দেশের মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। প্রাচীনকাল থেকে মেয়েরা সমাজ, শিক্ষাক্ষেত্রে অপমানের শিকার। দরিদ্র পরিবারে তো তাদের লেখাপড়ার সুযোগ অনেক কম। কিন্তু, মেয়েরা হলো সমাজের মেরুদণ্ড। তাই, তাদের শিক্ষিত হতেই হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই চালু করলেন— 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচি। বেশিরভাগ জনগণ বুঝল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

কথায় বলে ভারতবর্ষ গরিবের দেশ, এদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেক কম। কিন্তু তাতে তো দেশবাসীর চিন্তা নেই। কারণ, এদেশে আছেন মানবদয়ালু আদর্শ প্রধানমন্ত্রী। তিনি চালু করলেন— 'জনধন যোজনা'। তাতে দরিদ্র মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেল। স্বাস্থ্য মানুষের অত্যন্ত প্রিয় সম্পদ, তাই তাকে ভালো রাখা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী চালু করলেন যোগাভ্যাস। এই বিষয়টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নজরে এলে ২১ জুনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে ঘোষণা করল ।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত এখন সত্যি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করতে চলেছে। সব দেশের সঙ্গে তার তৈরি হয়েছে সুসম্পর্ক যা ভারতকে শিক্ষা, অর্থ, চিকিৎসা, শিল্প-বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা সবকিছুতে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের সাফল্যে যখন সারা বিশ্ব মুগ্ধ তখন দেশে হিংসার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। তাদের ক্রমাগত সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের ফলে অনেক সেনা-জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। পাকিস্তান হুমকি দিচ্ছিল যে তারা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতকে ধ্বংস করবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে তাতেও টলানো যায়নি। সেনা প্রধানের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর নেতৃত্বে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে' ধ্বংস হয়েছে সাতটি পাক জঙ্গি ঘাঁটি।

প্রধানমন্ত্রী মাসে একদিন করে 'মন কী বাত' অর্থাৎ মনের কথা দেশবাসীকে বলেন। এতে বোঝা যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগাযোগ। তিনি তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানী এপিজে আব্দুল কালামের আদর্শে বিজ্ঞানমনস্ক হতে বলেছেন। তাঁর এক মহা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হলো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল। যেসব ধনী ব্যক্তি আয়কর ফাঁকি দেন বা হিসাব বহির্ভূত অর্থ জমা রাখেন তাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। এতে দেশের আর্থিক লাভ হয়েছে এবং জঙ্গি সংগঠনের ক্ষতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেই ব্যক্তিদের অঘোষিত আয় জানিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা তা করেননি। ফলে, নোটগুলি এখন কাগজে পরিণত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে দেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর, সীমান্তে থাকা জওয়ানদের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হওয়ার জন্য তিনি দীপাবলীতে তাদের পাশে থেকেছেন। তাঁর জন্য সারাদেশ গর্বিত।

—**দেবাশ্রিতা ভট্টাচার্য,**
কালনা।

প্রয়াত সূর্যনারায়ণরাও

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বর্গত প্রচারক সূর্যনারায়ণ রাও-য়ের স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে প্রথমে যে দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হলো তার নির্মেদ বড় শরীর। আমার তার সঙ্গে তিনদিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সালটা ছিল ১৯৯৮। তখন সূর্যনারায়ণজী ছিলেন অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ। বাংলায় তিনি প্রবাস করছেন। আমি হাওড়া মহানগরের বেলুড়মঠের সন্নিকটস্থ একটি নগরে প্রচারক হিসেবে রয়েছি। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল সূর্যনারায়ণজীকে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় (ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ) স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো। সূর্যনারায়ণজীর তিন দিনের প্রবাসে হাওড়া মহানগরের বিভিন্ন জায়গায় প্রবাসের সঙ্গী হই। বেলুড় মঠের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তার পূর্ব পরিচিত এবং তাঁরা প্রায় ২০ মিনিট নানান বিষয়ে কথোপকথন করলেন, পরে সূর্যনারায়নজী মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহারাজও স্বাভাবিক ভাবে আমার হাত ভর্তি লজেন্স দিয়ে বললেন 'every time welcome'। কথাটি আমাকে মোহিত করে রেখেছে, আগামী দিনেও রাখবে। মহারাজের নানান ব্যস্ততায় নানা সময় যখন যেভাবে সঙ্ঘের ছোট্ট বড় কার্যকর্তাদের নিয়ে গেছি তিনি তাঁর কাজ সরিয়ে রেখে অসুস্থতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের জন্য আলাদা সময় দিয়ে সঙ্ঘের কাজ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতেন। তিনি হায়দরাবাদে থাকাকালীন সঙ্ঘের বহু অনুষ্ঠানে গেছেন তা আমাকে প্রায়ই বলতেন। মঠে অনেক সন্ন্যাসী স্বয়ংসেবক আছেন। বর্তমানে তার সংখ্যাটি প্রায় ৫০ জন হতে পারে, যাঁরা সঙ্ঘের কাজের শুভানুধ্যায়ী এবং তারা সঙ্ঘের কথাই বাকি সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। সঙ্ঘ সম্বন্ধে সমাজে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করায় সচেষ্ট হন। সূর্যনারায়ণজীর

সম্বন্ধে শুনেছি তিনি ইমারজেন্সিতে তামিলনাড়ুর কোনো জেলে বন্দি ছিলেন। ওই সময় তামিলনাড়ুর মঠের মহারাজ ওই সংশোধনাগারে বিবেকানন্দ বিষয়ক কথা বলতে যেতেন কয়েদিদের সংস্কারের জন্য। সূর্যনারায়ণ তাতে বিশেষ ভাবে অংশ নিতে থাকেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র পড়ে শেষ করেন। তার জীবন এবং কর্ম ছিল বিবেকানন্দময়। বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকীতে তিনি বিবেকানন্দ বিষয়ক একটি বইও লেখেন। ঈশ্বরের নিকট তার পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি।

—এম এম সিংহ,
ডুমুরজলা, হাওড়া।

নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা

তৃণমূলের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত

চলতি বছরের ১৯ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র একটি সংশোধনী এনে সংসদে বিল পেশ করে। উত্থাপিত এই বিলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ''বর্তমান এই আইনের ধারা অনুযায়ী আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পার্শি ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সব মানুষ বৈধ নথিপত্র ছাড়া ভারতে এসেছেন বা তাদের নথিপত্রের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে তাদের অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন না। ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য যাতে তারা আবেদন করতে পারেন সে প্রস্তাব রাখা হয়েছে এই বিলে। লোকসভায় পেশ করা এই নতুন বিলের ১ম অনুচ্ছেদে বলা আছে— এই বিলের নাম নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬। গত ২৬ অক্টোবর বুধবার তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, ''১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের যে সংশোধনী এনে বিল পেশ করা হয়েছে, আমরা তার বিরোধিতা করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেননা এই সংশোধনী ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর ওপর তীব্র আঘাত।"

ভারত স্বাধীনতা লাভ করে দ্বিজাতি তত্ত্বের মতবাদের যুক্তিকে অবলম্বন করে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশই ইসলামিক রাষ্ট্র। সংখ্যালঘুরা উভয় দেশেই নিরাপত্তাহীনতায় নিমজ্জিত। বর্তমানে পাকিস্তান প্রায় হিন্দুশূন্য আর বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম। এক সমীক্ষা বলছে আফগানিস্তানে বেঁচে আছে মাত্র ২২০টি হিন্দু পরিবার। কাজেই এইসব দেশের অ-মুসলমান মানুষজন নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বৈধ বা অবৈধ যে-কোনো ভাবেই ভারতে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। ওদের সামনে ভারত ব্যতীত অন্য কোনো পথই বিপন্মুক্ত নয়। তারপর এটাও বলা যেতে পারে যে এইসব বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে সব থেকে বিপন্ন হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুরা। তাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এসে দেশের সর্বত্র আশ্রয় গ্রহণ করলেও প্রধানত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাজ্য অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন। অসমের উদ্বাস্তুরা অসম চুক্তির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত। এমতাবস্থায় এই হতভাগ্য মানুষগুলির ভরসা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সরকার তথা জনগণ। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুরাও খুবই অসহনীয় অবস্থায় বসবাস করছেন। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে উত্থাপিত নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল-২০১৬ এইসব হতভাগ্যদের দুরবস্থা দূর করার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে যদি তৃণমূল কংগ্রেস এই বিল সমর্থন বা প্রয়োজনীয় সংশোধনে এগিয়ে না আসে তা হলে হয়তো এই বিলের মৃত্যুঘণ্টা বেজে যাবে। উদ্বাস্তুর পাহাড় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিনযাপন করবে এবং তৎসঙ্গে অসমের উদ্বাস্তুরাও বিপন্ন বোধ করবেন। অসমের উদ্বাস্তু স্রোত যে পশ্চিমবঙ্গমুখী হবে না তারও কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। একটা প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই আসতে পারে, নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল-২০১৬ আটকে গেলে সংখ্যালঘুদের লাভটা কীভাবে হবে, সেটা তৃণমূল কংগ্রেসকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এই বিল আটকে গেলে পশ্চিমবঙ্গকে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে অনিশ্চিত কালব্যাপী হাবুডুবু খেতে হবে এবং এটা হবে রাজ্যের জন্য একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

—জহরলাল পাল,
লিঙ্করোড, শিলচর।

সূর্য স্থির নয়

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান ও সনাতনধর্ম' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে মহান জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (৪৭৬-৫৫০ খ্রি.) গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে দেখিয়েছেন, সূর্য স্থির থাকে, পৃথিবী ঘোরে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিদগণও একই কথা বলেছিলেন। পৃথিবী ঘোরে একথা যেমন ঠিক, তেমনি সূর্যও ঘোরে। মহাশূন্যে কোনো বস্তু স্থির থাকতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান উন্নতমানের দূরবিন মারফত প্রমাণ করেছে, সূর্য স্থির নয়, সেও নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের ঠিক মধ্যবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করছে। এইভাবে এক পাক ঘুরতে সূর্যের সময় লাকে ২৫ দিন। এই আবর্তনের বেগে সূর্য ১ সেকেন্ডে ১৯০ কিলোমিটার হিসাবে দিনে প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার কিমি পথ অতিক্রম করে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের ঠিক মধ্যবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করছে। একবার প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগছে প্রায় ২০ কোটি বছর। আর্যভট্ট সেযুগে যে যন্ত্রের মাধ্যমে সূর্যকে স্থির থাকতে দেখেছিলেন, বর্তমানে আরও উন্নত দূরবীনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে— সূর্য স্থির নয়। শূন্যে কোনা বস্তু স্থির থাকতে পারে না। স্থির থাকতে হলে কোনো বস্তুর উপর দাঁড়াতে হবে। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে সূর্যকে স্থির বলে বোধ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট ও পাশ্চাত্যের জোতির্বিদগণের মতামতকে মান্যতা দেওয়ার আগে ভাবতে হবে।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

পরম্পরা

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস

দেবপ্রসাদ মজুমদার

ভারতবর্ষে সর্বকালের প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। সত্যই যে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তা তাঁর জন্মকাহিনিতেই স্পষ্ট। যতদিন ভারতে সনাতন ধর্ম জাগরুক থাকবে ততদিন ব্যাসদেবের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। মহাভারত-স্রষ্টা এই মহামানব তাঁর আত্মজীবনীর কিছু অংশ নিজেই মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য হতে হয় ওই মহামানব নিজ জীবন ও জন্মকাহিনি কত সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করেছেন। এতে তাঁর সত্যস্বরূপটিও প্রকটিত হয়েছে। যে বংশে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন তা প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি বংশ। এই বংশের কাছে সনাতন ধর্মের প্রত্যেকটি মানুষ ঋণী বলা যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রপিতামহ ছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ, তাঁর পিতামহ ছিলেন মহর্ষি শক্তি। পিতা ছিলেন মহর্ষি পরাশর আর ব্যাসপুত্র ছিলেন পরমপুরুষ শুকদেব।

মহাভারতের আদিপর্বে সত্যসন্ধ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নিজেই ব্যক্ত করেছেন নিজ জন্মপরিচয়। অদ্রিকা নামে মৎস্যরূপিণী এক অপ্সরার গর্ভে চেদিরাজ উপরিচর বসুর ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মৎস্যরূপিণী অপ্সরার গর্ভজাত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে ওই কন্যার দেহে মৎস্যের গন্ধ পাওয়া যেত। সম্ভবত আঁশটে গন্ধ সহ্য করতে না পেরে রাজা কন্যাটিকে লালন পালনের জন্য এক ধীবরকে দান করেন। ওই মৎস্যগন্ধা কন্যাই হলেন সত্যবতী, যিনি কালো ছিলেন বলে কালী। বাস্তবিক ওই মহিয়সী মহিলাই মহাভারতের সমস্ত কাহিনি ও ধারার মূল সূত্র বলা যায়।

কালক্রমে সেই মৎস্যগন্ধা কন্যা পালক ধীবর পিতাকে সাহায্য করার জন্য যমুনানদীতে খেয়া পারাপারের কাজ করতে শুরু করলেন। একদিন তীর্থ ভ্রমণকালে সেই খেয়াঘাটে এসে উপস্থিত হলেন মহামতি মহর্ষি পরাশর। দেখলেন সেই ধীবর কন্যাকে। ধীবরকন্যার অসামান্য রূপ লাবণ্যে মোহিত হলেন মহর্ষি। তাঁর সংযমের বাঁধ ভাঙল। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাটিকে লাভ করবার জন্য প্রস্তাব করলেন। এই প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে তৎকালে কোনো মহর্ষিকে দেহদান সমাজে খুব একটা নিন্দনীয় ছিল বলে মনে হয় না। মহর্ষির প্রস্তাবে মৎস্যগন্ধা কালী মহর্ষিকে যথোপযুক্ত সম্বোধন করে বললেন, এখানে প্রকাশ্যে সকলের সামনে তিনি কীভাবে তাঁর বাসনা পূর্ণ করবেন? মৎস্যগন্ধার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মহর্ষি যোগবলে গাঢ় কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করলেন। চারদিক ঘন কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে গেল। বিস্মিতা, লজ্জিতা মৎস্যকন্যা মহর্ষিকে অনুরোধ করলেন— "হে মহর্ষি, আমি কুমারী ও বর্তমানে পিতার অধীন। আমার কুমারীত্ব নষ্ট হলে কী প্রকারে আমি গৃহে ফিরে যাব? আর কী প্রকারেই বা জীবন ধারণ করে সমাজে বাস করব? আমার অবস্থা চিন্তা করে যা যথার্থ হয় তাহাই করুন।" কন্যার ওইরূপ বাক্যে মহর্ষি অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন— "হে কন্যা, আমার অভিলাষ পূর্ণ করলে তোমার কুমারীত্ব দূষিত হবে না, তুমি পূর্ববৎ কুমারীই থাকবে। আর তুমি কী বর চাও বল। আমার প্রসাদে তোমার সমস্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।" মৎস্যকন্যা প্রার্থনা করলেন, তাঁর দেহের মৎস্যগন্ধ দূর হয়ে যেন পদ্মগন্ধ সুরভিত হয়। তৎক্ষণাৎ মহর্ষি তাঁর প্রার্থিত বর দান করলেন। মৎস্যগন্ধা পদ্মগন্ধায় পরিণত হলেন। তাঁর দেহ সৌরভ এক যোজন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হলো। এরপর থেকে তিনি যোজনগন্ধা এবং গন্ধবতী নামে খ্যাত হলেন। যোজনগন্ধা সত্যবতী সানন্দে মহর্ষি পরাশরের অভিলাষ পূর্ণ করলেন এবং এর ফলস্বরূপ সেই দ্বীপমধ্যে এক বীর্যবান পুত্রের জন্মদান করলেন।

লীলাময় ভগবানের লীলায় এক ধীরবকন্যার গর্ভে ও মহর্ষি পরাশরের ঔরসে নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করলেন যে শিশু, তিনিই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। ব্যাসদেব স্বয়ং মহাভারতে তাঁর জন্মকাহিনি এই ভাবে অকপটে স্তব করেছেন যা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কতটা সত্যনিষ্ঠা থাকলে নিজের জন্মবৃত্তান্ত এমন অকপটে প্রকাশ করা যায়। ইচ্ছা করলেই তো তিনি নিজ জন্মকাহিনি অন্যভাবে প্রকট করতে বা না করতে পারতেন।

কিন্তু একমাত্র অসাধারণ সত্যনিষ্ঠাই তাঁকে নিজ জন্মবৃত্তান্ত এমন সহজ সরল ভাষায় অকপটে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে।

মহাভারতের আদিপর্বেই আমরা লক্ষ্য করি জন্মানোর পরমুহূর্তেই মাতার অনুমতি নিয়ে ব্যাসদেব তপস্যার জন্য যাত্রা করলেন। আর মায়ের কাছে অঙ্গীকার করে গেলেন, যখনই জননী তাঁকে স্মরণ করবেন তখনই তিনি মাতৃ সমীপে উপস্থিত হবেন। মহাভারত পাঠে আমরা লক্ষ্য করি তাঁর এই অঙ্গীকার তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন।

মহাভারতের আদি পর্বেই আমরা তাঁর নামের কারণ ও ব্যাখ্যা পেয়ে থাকি। নিজের মায়ের মতো তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণকায়। সেইজন্য তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ। যমুনা নদীর দ্বীপমধ্যে তাঁর জন্ম তাই তিনি দ্বৈপায়ন। তিনি তপস্যা করে মহর্ষি পদবাচ্য হয়েছিলেন এবং অসামান্য প্রজ্ঞা ও তপোবলে বেদ চতুষ্টয়কে ভাগ করেছিলেন বলে খ্যাত হয়ে ছিলেন বেদব্যাস বা সংক্ষেপে ব্যাসদেব নামে। হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে তিনি তপস্যায় রত ছিলেন তাই তাঁকে বলা হয় বাদরায়ণ। যাঁরা এখন বদ্রীনারায়ণে বদ্রীনাথ দর্শনে যান ওই স্থান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে মানা গ্রামের কাছে ব্যাসগুহা দর্শন করে নিতে পারেন। অলকানন্দা তীরে হিমালয়ের পাদদেশে ওই ব্যাসগুহা আপনাকে অবশ্যই বিস্মিত করবে সন্দেহ নেই।

কালক্রমে মহর্ষি ব্যাসদেবের মতো সত্যবতী কুরুবংশের রাজরানি হলেন। পুত্র বিচিত্রবীর্যের অকাল প্রয়াণে অপুত্রক বিচিত্রবীর্যের ভার্যাদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে নিয়োগ প্রথা অনুসারে পুত্রজন্মের জন্য মাতা সত্যবতী ব্যাসদেবকে আদেশ করেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী ও মহর্ষি হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র মাতৃ আদেশ পালন করবার জন্য তিনি অম্বিকা, অম্বালিকা ও এক দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদান করেন। মহাভারতের আদিপর্বের এই স্থানেই মহর্ষি দ্বৈপায়নের যৌবনের এক চেহারার বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সারামাথা ব্যাপ্ত ছিল কপিল বর্ণের জটায়, লোচনদ্বয় সমুজ্জ্বল আর মুখ ভর্তি ছিল পিঙ্গল বর্ণের শ্মশ্রুতে। তাঁর এই ভয়ঙ্কর তমোক্লিষ্ট চেহারা দেখেই বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। পরিণামে জন্ম হলো জননীর দোষে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। রানি অম্বালিকা মহর্ষির বিকটরূপ দর্শন করে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিলেন। পরিণামে জন্ম হলো পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত পাণ্ডুর। পরে মাতৃ আদেশে আবার অম্বিকার গৃহে গেলে দাসী সুসজ্জিতা হয়ে মহর্ষির অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হলেন, জন্ম নিলেন মহামতি বিদুর। জননীর আদেশ প্রতিপালিত করে তার পরিণাম সম্বন্ধেও অবহিত করে রাজধানী ত্যাগ করলেন।

ব্যাসদেব ছিলেন সিদ্ধ মহাত্মা ও নানান অলৌকিক শক্তির অধিকারী। শুধু নিজ জননীই নয়, প্রয়োজনে কেউ তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি বুঝতে পারতেন। যখনই কুরু-পাণ্ডব বংশে কেউ বিপদাপন্ন হয়েছে, বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে তিনি তা জানতে পেরে উপস্থিত হয়ে সদুপদেশ দান করেছেন। বাস্তবিক ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর তাঁর পুত্র এবং দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরেরা তাঁর পৌত্র। তাই তাদের সর্বদা ধর্মপথে চালিত করার সম্যক চেষ্টা করেছেন তিনি। পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যাতে রক্তক্ষয়ী কুলক্ষয়ী যুদ্ধ না ঘটে সেজন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কালধর্ম প্রবল হওয়ায় তাঁর সমস্ত উপদেশই ব্যর্থ হয়েছে।

মহামন্ত্রী সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষুদান, পুত্রশোকাতুরা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দান, যুধিষ্ঠিরকে গার্হস্থ্যধর্ম পালনের উপদেশ, প্রায়শ্চিত্তরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের উপদেশ, ভারতযুদ্ধে মৃত আত্মাদের দর্শন করানো প্রভৃতি কর্মে তাঁর অসাধারণত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে সহজেই তাঁকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলেই প্রতীয়মান হয়। জীবজগতের কল্যাণের নিমিত্তই তিনি কর্ম করেছেন ও তার জন্য উপদেশ দান করেছেন। সাক্ষীরূপ দ্রষ্টা হিসেবে অনাসক্ত ভাবেই তিনি সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেছেন।

ব্যাসদেব ছিলেন শান্ত সমাহিত মহাপুরুষ। মহাভারতে বা তাঁর সৃষ্ট পুরাণ, স্মৃতি প্রভতি শাস্ত্রে কোথাও তাঁর উগ্রতা প্রকাশিত হয়নি। শুধু তপস্বী বা মহর্ষি হিসেবেই নয়, গ্রন্থকার রূপে ও আদর্শ সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি চির অমর ও সর্বত্র সকলের পূজ্য।

মহর্ষি ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে তাঁর চার শিষ্য ও পুত্র যথাক্রমে সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন ও শুকদেবকে বেদচতুষ্টয় ও মহাভারত অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শুকদেব ছিলেন এক জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ। এছাড়া লোমহর্ষণ মুনিকে তিনি ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, বেদান্তদর্শন, ভাগবত, ব্যাস সংহিতা, পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁর সৃষ্টি ও রচনা। তাই বলা হয় 'ব্যাসচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বং'— জ্ঞানরাজ্যের সমস্তই ব্যাসদেবের উচ্ছিষ্ট স্বরূপ। জ্ঞানরাজ্যের এমন কোনো স্থানবা প্রদেশ নেই যেখানে তিনি পদার্পণ করেননি।

তথ্যসূত্র :

মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ।
মহাভারত—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
মহাভারতের চরিতাবলী, সুখময় ভট্টাচার্য।
অন্যা সাময়িক পত্রপত্রিকা।

প্রখ্যাত মনীষীদের ভারত ব্যাখ্যান

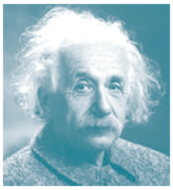

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন : (১৮৭৯-১৯৫৫)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তাঁর বিশেষ অবদান : আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ‘আপেক্ষিকতাবাদের’ সিদ্ধান্ত।

উদ্ধৃতি : আমরা ভারতীয়দের কাছে চিরদিন গভীর ঋণে আবদ্ধ থাকব, কারণ তারা আমাদের গণনা করতে শিখিয়েছে, যেটা ছাড়া উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হোত না।

উৎস : ইগনাইটেড মাইন্ডস : আনলিসিং দ্য পাওয়ার উইদিন ইন্ডিয়া : এ. পি. জে. আবদুল কালাম।

টি. এস. ইলিয়ট : (১৮৮৮-১৯৬৫)
পরিচিতি : ইনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক, আমেরিকা-জাত বিখ্যাত বৃটিশ কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে আছে তাঁর অন্যতম রচনা, ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’।

উদ্ধৃতি : ১. প্রাচীন ভারতের মহান দার্শনিকদের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় মতবাদের সামনে পাশ্চাত্যে বিখ্যাত দার্শনিকদেরও যেন পাঠশালার ছাত্রের মতো দেখায়। ২. চার্লস্ ল্যানমানের কাছে দু’বছর সংস্কৃত এবং জেম্‌স উডের কাছে এক বছর ‘পতঞ্জলি’ দর্শনশাস্ত্র পড়ার পর নিজেকে মনে হয়েছে, আমি যেন অতীন্দ্রিয় আলোয় উদ্ভাসিত নতুন এক ব্যক্তি।

উৎস : আফটার স্ট্রেঞ্জ গড্‌স—টি.এস.ইলিয়ট।

বি.দ্র. : সংস্কৃত ভাষা শিখে ইলিয়ট সংস্কৃতে রচিত মূল বেদ, উপনিষদ ও শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতা অধ্যয়ন করেন।

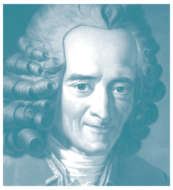

ফ্রাঁশোয়া. এম. ভলটেয়ার : (১৬৯৪-১৭৭৮)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন ফ্রান্সের সর্বোত্তম সাহিত্যিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক। তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের অগ্রদূতও বলা হয়। তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্র, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ধর্মযোদ্ধা। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ‘ক্যান্ডিড’।

উদ্ধৃতি : আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে, সব কিছুই আমাদের কাছে এসেছে গঙ্গার তীর থেকে, যেমন—খগোলবিদ্যা, জ্যোতিষ, পুনর্জন্মবাদ, অধ্যাত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে পিথাগোরাস অন্ততপক্ষে ২৫০০ বছর আগে ‘সামোস’ থেকে রওনা হয়ে গঙ্গার তীরে পৌঁছেছিলেন জ্যামিতি শেখার জন্য। তিনি নিশ্চয় এই কঠিন পর্যটনে বের হতেন না, যদি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের আবিষ্কৃত সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ ইউরোপে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত না হোত।

উৎস : রাইডিং দি ইন্ডিয়ান টাইগার : উইলিয়াম নব্‌বেগা, আশিস সিনহা।

উদ্ধৃতি : বেদ হচ্ছে পাশ্চাত্যকে দেওয়া সর্বোত্তম উপহার যার জন্য তাকে সর্বদাই প্রাচ্যের কাছে ঋণী থাকতে হবে।

উৎস : এক্‌লেক্‌টিক ম্যাগাজিন : ফরেন লিটারেচার—জন হোম্‌স এগ্‌নিউ, ওয়াল্টার হিলিয়ার্ড বিড্‌অয়েল।

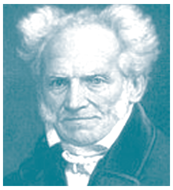

অর্থার শোপেনহাওয়ার : (১৭৮৮-১৮৬০)
পরিচিতি : ইনি জার্মানির অন্যতম প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং লেখক। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত মনীষীর, যেমন ফ্রেড্রিক নিৎশে, রিচার্ড ওয়াগ্‌নার, লাড্‌উইগ্ উইট্ জেনস্টেইন, এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, সিগ্‌মুন্ড ফ্রাইড, অটো র‍্যাঙ্ক, কার্ল জুং, মিহাই এমিনেসকিউ প্রমুখকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

উদ্ধৃতি : এই পৃথিবীতে উপনিষদের মতো আর এমন কোনো হিতকারী গ্রন্থ নেই যা মানব মনকে এত উন্নত করতে সক্ষম হয়। এ আমার জীবন এবং মৃত্যুর সর্বোত্তম সান্ত্বনাদায়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সর্বোচ্চ জ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ফসল।

উৎস : দি ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া : জওহরলাল নেহরু।

উদ্ধৃতি : পূর্ববর্তী শতাব্দী অপেক্ষা এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হচ্ছে বেদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

বেদের মহৎ আদর্শের পরিণতি উপনিষদ। যাঁরা শ্রমসাধ্য পার্শিয়ান এবং ল্যাটিন চর্চার মাধ্যমে এই অতুলনীয় পুস্তকটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা কতই না আত্মার গহন আদর্শে আলোড়িত হয়েছিলেন।

উৎস : অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী— পরমহংস যোগানন্দ (এই বইটি অ্যাপল্ এর কর্ণধার স্টীভ জোবস্ এর সারা জীবনের সঙ্গী ছিল। কিশোর বয়সে তিনি একবার পড়েছিলেন, পরে ভারতে এসে আর একবার পড়েন। সেই থেকে নিয়মিত বছরে একবার পাঠ করতেন। —ওয়াল্টার ইসাকসন লিখিত স্টীভ জোবস্-এর জীবনী।)

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

সততা

নবাঙ্কুর

ভালো মানুষ

পুরুলিয়ার একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ সুবলচন্দ্র। বাজারে দশকর্মার দোকান। নাম দীনবন্ধু ভাণ্ডার। প্রথম প্রথম যে দেখে সেই ভাবে এই দীনবন্ধু নিশ্চয়ই সুবলচন্দ্রের নিকট আত্মীয় কেউ। তারপর জানতে পারে আসলে তা নয়। কারো বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন যাই হোক না কেন, হাতে টান থাকলেও দশকর্মার অভাবে কাজ আটকায় না। সহায় হন সুবলচন্দ্র। আর প্রতি বছর গরিব মানুষের এরকম কিছু অনুষ্ঠানে সুবলচন্দ্র নিজে থেকেই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই দোকানের নামটিও সেরকম, দীনবন্ধু ভাণ্ডার।

সুবলচন্দ্রের নিজের সংসার আছে। বাড়িতে বউ, ছেলেমেয়ে আছে। ছেলেমেয়ে দুটো ছোট। দোকানের ওই সামান্য আয়। দিন আনা দিন খাওয়া। অভাবের শেষ নেই। প্রতিদিন বউয়ের কাছে শুনতে হয় এটা নেই, সেটা নেই। সেই সঙ্গে বউয়ের মুখঝামটা—দোকানে ধার দিয়ে আর অন্যের উপকার করতে গিয়ে তো আমাদের শুকিয়ে মারবে তুমি!

সুবলচন্দ্র জানে বউটা মুখে ওরকম বলে, কিন্তু মনে মনে সেও বড় ভালো। ওই তো সেবার বাপের বাড়ি গিয়ে সুবলচন্দ্রের কত নাম করলো। বড় গলা করে বলল— তাদের দোকানে বিপদে পরে কেউ এলে ফিরে যায় না। তাই কখনো সখনো মুখ ঝামটা দিলে সে কিছু মনে করে না। সে তো সত্যি কথাই বলে, দান করা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু ধারে জিনিস দিলে তো সেই পয়সা তুলতে হবে। কিন্তু কেন জানি সুবলচন্দ্র সেই কাজটি পারে না। ভাবে হাতে পয়সা এলে দেবে একদিন মিটিয়ে।

পরোপকারী ও ভালো মনের সুযোগ নিয়ে মানুষ যে তাকে ঠকায় না তা নয়। একবার এক কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা এসে হাজির। বলে, তার নাকি মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে

হঠাৎ করেই। তাই পয়সাকড়ির জোগাড় করে উঠতে পারেনি। আপাতত বাকিতে দশকর্মার সব মাল দিতে হবে। বিয়ে মিটে গেলে সব শোধ করে দেবে। সুবলচন্দ্র হাসিমুখে সব দিয়ে দিল। তারপর মাস যায়, বছর যায়, ধার মেটাতে সেই মানুষ আর আসে না। বাড়ির ঠিকানা লেখা ছিল। সুবল খোঁজ করে দেখে ওই ঠিকানায় সেরকম কেউ থাকেই না।

দীনবন্ধু ভাণ্ডারের পাশেই নিতাই ঘোষের মুদিখানা। নিতাই বড় চালাকচতুর। সুবলচন্দ্রের কাণ্ডকারখানা দেখে বেশ মজা পায় সে। হাসি টিটকিরি করে। ওই সামান্য মুদিদোকান করেই দোতলা বাড়ি, জমি করেছে। তাই দেখে সুবলের বউ বলে—নিতাইকে দেখ, তোমার থেকে বয়সে ছোট, অথচ কত কী করেছে। বউয়ের গয়না, বাড়ি জমি। আর তুমি?

সুবল মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বলে— আমি পারব না কেরোসিনের সঙ্গে জল মিশিয়ে বিক্রি করতে। সকাল সকাল দোকান খোলা সুবলের অভ্যাস। একদিন বাজারে ঢুকতেই শোনে, পাঁচশো টাকার নোট আর হাজার টাকার নোট নাকি বাজারে অচল। ওসব আর চলবে না। যার যা আছে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। সবাই জটলা করে ওই কথাই বলছে। নিতাই বেলা দশটা বাজতেই দোকান বন্ধ করে চলে গেল, তার নাকি ব্যাঙ্কে অনেক কাজ। সুবলের তাড়া নেই, পাঁচশো হাজারের কারবার সে করে না। তাই জমা দেওয়ার ব্যাপার নেই। সেদিন রাতে দোকান বন্ধ করতে যাবে এমন সময় নিতাই এসে হাজির। বলে, কথা আছে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো ব্যাঙ্কে খাতা আছে কি না। সুবল একবার একখানা খাতা খুলেছিল, কিন্তু টাকা পয়সা সেরকম নেই।

শুনে নিতাই বলে, আমাদের নগেনবাবু আড়াই লাখ করে টাকা দিচ্ছে। ওই টাকা তোমার খাতায় জমা করলে পঞ্চাশ হাজার তোমার। যদি চাও তো এনে দিতে পারি।

সুবল ব্যাপারখানা বুঝতে পারে না। জমা করলেই কেন পঞ্চাশ দেবে? নিতাই বলে ওসব বুঝে তোমার কী কাজ? এক লাফে পঞ্চাশ হাজার! সারা বছর দোকান করেও কামাতে পারবে না।

সুবল মাথা নেড়ে বলে, পরের কামাই আমার দরকার নেই। শুনে নিতাই একটা কটু কথা বলে চলে গেল। রাতে বাড়ি ফিরে বউকে কথাটা বলতেই সেও ঝাঁঝিয়ে উঠলো। বলল— তুমি সারাজীবন এমন বোকাই থেকে যাবে। একটু চালাকচতুর হও।

সাতদিন পর সুবল দোকান খুলতে গিয়ে দেখে নিতাইয়ের দোকানের সামনে জটলা। ওর দোকান বন্ধ। শোনে, দোকান খুলতেই নাকি পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। দোকানটাও বন্ধ করে দিয়েছে। গত রাতে নগেনবাবুকেও নাকি ধরেছে। সবাই বলছে, নগেনবাবু আর নিতাই মিলে নাকি মেলা টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছে। সব কালোটাকা।

টাকা আবার কালো হয়? সুবল প্রথম শুনলো। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি দোকান খুললো সে। অনেকক্ষণ ধরে বেচারা রাজেন কবরেজের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আজ ওর বাপের শ্রাদ্ধ। তাকে মালপত্তর দিতে হবে। হোক না বাকিতে!

ত্রিদিব সোম

রাজ্য পরিচিতি

দিল্লি

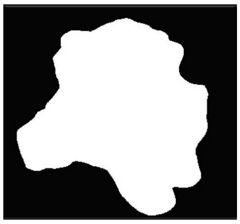

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দিল্লি বিভিন্ন সময় ভারতের রাজধানী ছিল। মহাভারতে উল্লিখিত ইন্দ্রপ্রস্থ এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। তারপর বহু হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল এখানে। মুঘল ও ইংরেজদের সময়েও ভারতের রাজধানীও ছিল দিল্লি। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পঞ্জাবের সংযোগসীমায় এই শহরটি অবস্থিত। সরকারিভাবে যাকে জাতীয় রাজধানী বলা হয়। দিল্লি ভারতের দ্বিতীয় জনবহুল শহর। কেন্দ্রশাসিত হিসেবে দিল্লির প্রসানিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তবে দিল্লির নিজস্ব হাইকোর্ট, বিধানসভা ও মুখ্যমন্ত্রী-সহ মন্ত্রীপরিষদ আছে। রাজত্ব পরিবর্তন হওয়ার কারণে দিল্লির ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলির নাম ও পরিচয় সময়ে সময়ে বদলে গেছে। লালকেল্লা, কুতুবমিনার, ইন্ডিয়া গেট ইত্যাদি এখানকার দর্শনীয় স্থান। বর্তমানে দিল্লির জনসংখ্যা ১ কোটি ৬৩ লক্ষ। আয়তন ১ হাজার ৪৮৪ বর্গকিলোমিটার।

এসো সংস্কৃত শিখি

एवं चेत् कथम् ?

এরকম হলে কেমন ?

मां किञ्चित् स्मारयतु।

আমাকে একটু মনে করাবেন।

तम् अहं सम्यक् जानामि।

তাকে আমি ভালো ভাবেই জানি।

तदानीमेव उक्तवान् खलु ?

তখনই আমি বলেছিলাম না ?

कदा उक्तवान् ?

কখন বলেছেন ?

ভালো কথা

গোবর পাগলা

আমরা থাকি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। সেই কারণে চারপাশ এমনিতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেই পরিচ্ছন্নতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের গোবর পাগলা। সবাই ওকে পাগলা বলে। আসলে কতটা পাগলা তা আমি জানি না। তবে সে যে কাজটি করে সেটি খুব ভালো। সে রাস্তার গোবর পরিষ্কার করে। যেখানেই দেখে রাস্তায় গোবর পড়ে আছে অমনি দৌড়ে গিয়ে তুলে নেয়। এতে রাস্তাও পরিষ্কার, কারো পায়ে লেগে নোংরাও হয় না। নিজের সারা গায়ে গোবর মেখে রাস্তা সে পরিষ্কার রাখে।

ঐশী মজুমদার, সপ্তম শ্রেণী, ব্যারাকপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

গরম চা

অম্লান কর, পঞ্চম শ্রেণী

সাতসকালে গরম চা
চুমুক দিতেই দারুণ মজা,
ধোঁয়া ওঠে নরম নরম
পালিয়ে যায় শীতের কাঁপন।

গোল বিস্কুট ডুবিয়ে নিলে
মুখে দিতেই যায় গলে,
নানা স্বাদের চায়ের সাথে
সকালবেলায় থাকি মজে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

শরৎ সাহিত্যে নারী

আঁখি মহাদানী মিশ্র

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন বাঙালি নেই বললেই চলে। তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষ একধরনের মানবিকতা রয়েছে। শুধু বাঙালি নয়, ভারতবর্ষের যেখানেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পৌঁছেছে সেখানকার মানুষ হয়ে গেছেন তিনি। শরৎচন্দ্রই এমন একজন সাহিত্যিক যিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। তাঁর সাহিত্যের বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে নারী চরিত্র। এই নারী চরিত্রের সর্বংসহা রূপটি প্রধানত তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

জীবনের নানান ক্ষেত্র ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন শরৎচন্দ্র তুলেছেন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে— তা সে যে সম্পর্কই হোক না কেন? বিশেষ করে আমাদের দেশের সমাজে, যেখানে মেয়েদের পায়ের তলার কোনো মাটি ছিল না। সমাজ ব্যবস্থা এমন ছিল যে নিজের ওপর নির্ভর করার কোনো নিরাপত্তা তাদের ছিল না। 'নারীর সার্থকতা শুধু কি সতীত্বের নাকি যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জনে'— এ প্রশ্ন তিনি বার বার তুলেছেন।

তিনি মনে প্রাণে দেশকে ভালবাসতেন, দেশের সমস্ত মানুষকে ভালবাসতেন। কারণ তিনি মনে করতেন সমস্ত দেশই তার ঘর। মানুষের কষ্ট তিনি অনুভব করতেন হৃদয়ের গভীরে। তবে তিনি মনে করতেন এর মূলে রয়েছে নিজেদেরই ত্রুটি। তিনি বলেছেন— "হ্যাঁ, এই যে দীনতা— এর মূলে রয়েছে নিজেদেরই পুঞ্জীভূত ত্রুটি। বহু ত্রুটির মাঝে অন্যতম ত্রুটি হলো নারীর প্রতি আমাদের ব্যবহার, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা।" তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বাইরের থেকে কেউ কোনো জাতির দুঃখ মোচন করতে পারে না। যতদিন না তারা নিজেরাই অন্যায়ের প্রতিরোধ না করতে পারছে ততদিন যথার্থ কল্যাণ সূচনা সম্ভব নয়।

তিনি মনে করেছেন, "পুরুষগুলো হয়েছে স্বার্থপর, এরা ষড়যন্ত্র করল, মেয়েজাতটার বিরুদ্ধে, মেয়েদের ভক্তি করা শুরু করল এরা কথায়, কিন্তু ঘৃণা করতে আরম্ভ করল কাজে। ফল, কল্পনার জগতে নারী পেল দেবীর আসন, কর্মজগতে স্থান হলো তার হেঁসেলে, দুটোর কোনোটাই নারীর অর্জিত বস্তু নয়— পুরুষের ইচ্ছানুরূপ পদবি লাভ"। তিনি মনে করেছেন নারীরা যেদিন থেকে পুরুষের দ্বারা নির্মিত এই দেবীমাহাত্ম্যে গর্ববোধ করল সেদিন থেকে জাতির বিনাশ ঘটেছে। 'চরিত্রহীন' লিখে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন সুধীসমাজে এবং 'গৃহদাহ'-তে নাকি তিনি নারীর মর্যাদাহানি করেছেন এমন অভিযোগই উঠেছিল। তিনি দেবীর মতো নারীজাতিকে ভক্তি না করলেও, সামান্য অপরাধে তাদের ঘৃণাও করতে পারেননি। তিনি সবাইকে দেখতেন মানুষের সহানুভূতি নিয়ে যেখানে নারী পুরুষের কোনো ভেদ নেই। দেবী মনে করে নারীভক্তি-ভণ্ডামির নামান্তর বলে তিনি মনে করেছেন। তবে তিনি নারীর প্রতি অবহেলাকে কোনো মতেই ক্ষমা করতে পারেন না। সমাজের মূলভিত্তি বলে মেনে নিয়েছেন এই নারীজাতিকে। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে একই সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে যে-কোনো কঠিন কাজে যদি তাদের ঠিকমতো সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি মনে করতেন 'ঘোমটাপরা, হেঁসেল ঠেলা' মেয়েদের হঠাৎ কঠিন দুর্গম পথে চলতে বাধ্য করলে তারা তো হোঁচট খাবেই, আর পারে না বলে সরিয়ে রাখলে হবে না, তাদের দিতে হবে সঠিক সুযোগ। দীর্ঘদিন ধরে নারীকে হেয় করার ফলে জাতি ও সমাজের অধঃপতন ঘটেছে। তিনি মনে করেছেন নর ও নারী একই গৌরবে যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন সাফল্য অসম্ভব।

শরৎ সাহিত্যের নারীরা মহিয়সী মূল্যবোধের জোরে সহিষ্ণুতা, আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা, সেবাপরায়ণতারই অংশ হয়েছেন। এই প্রকার নারীদের ভিড় শরৎসাহিত্যে বেশি। তবে আধুনিক নারীত্বের অপরাজেয় দৃপ্তভাব চোখে পড়ে অভয়া, কমল ও সুমিত্রার মধ্যে। শরৎচন্দ্র নিজেও চাইতেন এই রকম নারী চরিত্র গড়ে উঠুক ভারতবর্ষ জুড়ে। তিনি মনে করতেন নারীর গুরুত্ব সমাজে কম, কারণ এরা স্বেচ্ছায় এবং সহজেই সংসারে ধরা দেয়। তিনি 'নারীরমূল্য' প্রবন্ধে বলেছেন— "মণিমাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না তাহা দুষ্প্রাপ্য, এই হিসেবে নারীর মূল্য বেশি নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন।" ■

এবার রাজনীতিতে টাকার দাপটের সংস্কার দরকার

সত্যিই যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে কালোটাকার আধিপত্য দূর করতে হয় আর এ নিয়ে আমাদের প্রকৃত সদিচ্ছা থাকে তাহলে পথ অবশ্যই রয়েছে।

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

দেশে আর্থসামাজিক পরিবেশের ওপর তিন সপ্তাহ আয়ুর বিমুদ্রাকরণের অভিঘাত এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী। আরও বেশ কয়েক মাস না কাটলে এর দরুন দেশে কতটা উথাল পাথাল হয়েছে তার সঠিক হিসেব নিকেশ করা যাবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রথম দু'টো সপ্তাহে ব্যাঙ্ক ও এটিএমগুলো ঘিরে জনতার বড় বড় সারির ছবি টিভি ও সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়ে রাখছিল। পট পরিবর্তন হয়ে এখন প্রধানত এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যাশিত উপকার কতটা পাওয়া যাবে নাকি আদৌ যাবে না তার মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব কতটা পড়বে সেটিও বিচার্যের অন্তর্গত। কিন্তু সমস্ত বিশ্লেষণই হচ্ছে আপনি এই বিমুদ্রাকরণ প্রক্রিয়ায় কোন পক্ষে অবস্থান করছেন তার ওপর। এই লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনীতিকে কীভাবে কর ফাঁকি দেওয়া, বেআইনি কালোটাকার কলুষমুক্ত করা যায় তাকে কেন্দ্র করে। ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয় এ যাবৎ যুক্তিবাদী বলে পরিচিত কিছু লোকও বলে দিলেন বিমুদ্রাকরণের ফলে কালোটাকার ওপর কোনো আঁচড় লাগবে না। নিশ্চয়, বাজারে চালু টাকার পরিমাণগত হিসেবে কালোটাকার সংখ্যা ও তার অর্থমূল্য তুলনামূলকভাবে কম। এর চেয়ে ঢের বেশি নিয়মিত হয়ে যাচ্ছে স্থাবর সম্পত্তি বা সোনা-দানায় পরিবর্তিত হয়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজকর্মে প্ররোচনা দেওয়া ও ভাগীদার হওয়ার ক্ষেত্রে এই নগদ টাকার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। আর তাই কালোটাকার সামগ্রিক অর্থনীতিতে নগদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে এটি অবহেলার বস্তু কখনই নয়। অনুমান অনুযায়ী ৩ লক্ষ কোটি টাকার মতো অর্থ অর্থনীতিতে না ফেরার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে এগুলি তামাদি টাকা হয়ে যাবে।

এককালীন এই পরিচ্ছন্নতা-অভিযানে একটা বড় অংশের কালোটাকা মালিকদের হাত থেকে তা বেরিয়ে যাওয়াটা অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত ফলদায়ী। কিন্তু একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে পৌঁছতে গেলে আরও বেশ কিছু পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাজারে ত্রস্ত কানাকানি শোনা যাচ্ছে যে কালোটাকার কারবারিরা গরিব লোকের জনধন খাতাগুলি ব্যবহার করে তাদের অসাধু উপার্জন সাদা করার চেষ্টায় লিপ্ত— এটি সরকারের পক্ষে ভাল। সরকার সরাসরি এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে ও সঙ্গে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে বিমুদ্রাকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা তা যথেষ্ট বাড়িয়ে দেবে।

এর মধ্যে সুসংবাদ অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭৮ সালের বিমুদ্রাকরণের পর কালোটাকার ওপর আঘাত এলেও তা খুব দ্রুতই সগর্বে ফিরে এসেছিল। আজকের বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। প্যান নং ও আধার নম্বরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সমস্ত লেনদেন সংযুক্ত হয়ে থাকার ফলে কালোটাকার প্রাথমিক উৎপত্তিস্থলেই একটা চেক ভাল্ভ থাকছে। কিন্তু সব চেয়ে জরুরি যে পথে কালোটাকার রমরমা আটকানো যেতে পারে তা রাজনীতিক্ষেত্রে কালোটাকায় অনুদান পদ্ধতি উচ্ছেদ করা। বেশ কয়েক বছর আগে আইন কমিশন এ বিষয়ে নাগরিকদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করেছিল। সে সময় আমি নিজে এর প্রত্যুত্তরে আইন কমিশনকে আমার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমি একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও মত জানিয়েছিলাম। ২০১৫ সালে আইন কমিশন তাদের যে প্রস্তাবনা প্রকাশ করে তার মধ্যে নির্বাচনী স্বচ্ছতা আনতে বেশ কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা থাকলেও 'নির্বাচনী খরচ সংস্কার' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে কিন্তু সত্যি কথায় তেমন মৌলিক বা আমূল পরিবর্তন আনতে পারে এমন কোনো সাহসী পথের উল্লেখ ছিল না। আমার মতে, নির্বাচনী সংস্কারের বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্বাচনী খরচের ওপর রাশ টানা বা তাতে কড়া নজরদারি চালানোর দিকে জোর দেওয়ার থেকে যে টাকা চাঁদা হিসেবে সংগৃহীত হচ্ছে তার উৎসমূলের আইনগত বৈধতা ও ভবিষ্যতে সাহায্যদানকারীকে যাতে খুঁজে পাওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করাটাই একান্ত জরুরি। আমাদের দীর্ঘদিন ধরে লালিত ধারণা যে প্রার্থীর নির্বাচনী খরচের ওপর রাশ টানলেই কালোটাকার হদিশ মিলবে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে কালোটাকা স্থান বদলে কার্পেটের তলায় ঢুকে গেছে। এই জায়গাটাই কালোটাকার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ব্যবহারের কেন্দ্রস্থল। এখানেই কালোটাকা তৈরির যে মানসিক তাড়না, উৎপাদন ও ব্যবহারের কৌশল নির্ধারিত হয়।

নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের খরচের ক্ষেত্রে বৈষম্য (একজনের অত্যন্ত বেশি, অন্যজনের নিতান্ত কম) থাকলে তা সুস্থ গণতন্ত্রের পরিপন্থী এ ধারণাও ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হয়েছে। খরচে বেড়ি পরানোর থেকে আরও ভাল পন্থা অবশ্যই রয়েছে।

যে-কোনো অবস্থাতেই খরচে রাশটানা নিতান্তই অর্থহীন। এর পরিণতিতে আরও সন্দেহজনক সোর্স থেকে প্রয়োজনীয় টাকার জোগাড় করার তাগিদ বেড়ে যায়। অবশ্যই নির্বাচনী ময়দানে টাকা একটা প্রয়োজনীয় উপাদান হলেও সেটা কখনই নির্বাচনী সাফল্যের ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। দেখুন, মাল্টি বিলিওনেয়ার সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফল প্রচারাভিযানে খরচ কিন্তু পরাজিত হিলারির থেকে অর্ধেক ছিল।

তাই আবার বলছি, খরচে লাগাম পরানোর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা জানা যে, টাকাটা কোথা থেকে এল, উৎসমূলে কর দেওয়া আছে কিনা সেটা জানা। আর এটাও জানা যে, দাতাকে ভবিষ্যতে চিহ্নিত করা যাবে কিনা। এই কারণেই ২০ হাজার টাকার কম চাঁদা দিলেই দাতার আর কোনো হদিশ রাখার প্রয়োজন নেই এই ঊর্ধ্বসীমাকে অনেক নীচে নামিয়ে আনা দরকার। এই রাস্তাটাই কালোটাকা যাতায়াতের সর্বাপেক্ষা পঙ্কিল কিন্তু সহজগম্য পথ যেখান দিয়ে টাকার প্রবাহ থাকে বেগবান কিন্তু চিহ্নহীন।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার প্রস্তাবনায় উৎস নিরপেক্ষ টাকার অঙ্ক ৫ হাজার বললেও এখন মনে করছি বাস্তবে এই সীমাকে আরও নামিয়ে ১ হাজার বা পাঁচশো টাকা করাই শ্রেয়। এর ফলে একেবারে নির্দিষ্ট মানুষের কাছ থেকে কোনো সভা সমাবেশের ক্ষেত্রে সরাসরি এই অঙ্কের টাকা অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে। কেননা মোটা অঙ্কের অসংখ্য সব মালিকের নামহীন কালোটাকাকে আইনানুগ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

এছাড়া ধনী প্রার্থী ও জনপ্রিয় প্রার্থীর মধ্যে অর্থের প্রয়োজনীয় ব্যবধান ঘোচাতে সরকারের তরফে অর্থ সমর্থন দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের অন্য দেশের মতো প্রার্থী যে টাকা দাতার তরফে কর দেওয়া ও তাঁকে ভবিষ্যতে চিহ্নিত করার রাস্তা রেখে সংগ্রহ করেছেন তার ৫ গুণ অর্থাৎ ১ : ৫ হারে দেওয়া দরকার। সব প্রার্থী মিলিয়ে তাদের সংগৃহীত টাকার অনুপাতে ৫ গুণ টাকা সেই দলকেও একলপ্তে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একই সঙ্গে প্রার্থী ও দল উভয়ের ক্ষেত্রেই হিসেবের অডিট হওয়া আবশ্যিক করতে হবে। এই সময় কেবলমাত্র সেই অংশের টাকা যার উৎসমূলে কর কাটা হয়েছে সেই অনুদানটুকুই কর ছাড় পাবে, উৎসসন্ধানহীন টাকার ক্ষেত্রে সব ছাড় প্রযোজ্য হবে না। এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করতে গেলে নির্বাচন আয়োগের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দিতে হবে। সঙ্গে থাকবে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও। আর তার আওতায় থাকবে নগণ্য জরিমানার সঙ্গে গোটাগুটি নির্বাচন বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত। হায়! দেশের মধ্যে যে সংস্থাটিকে এখনও সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলে সকলের মান্য তাদের হাতে এমন ক্ষমতা এখনও নেই।

দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গত তিনটি মাস কিন্তু অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও চমকপ্রদ। এ যাবৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জি এস টি বিলটি প্রায় প্রয়োগের মুখে, পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক আর সবশেষ এই বিমুদ্রাকরণ। এই সিদ্ধান্তগুলি পছন্দ হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু বেশ কিছুটা সময় নিস্তরঙ্গ থাকার পর মোদী সরকার কিন্তু এখন প্রবল গতিতে ধাবমান। একথা স্বীকার করতেই হবে। এই উজ্জীবিত সরকার 'চলতা হ্যায়' ধাঁচের না হয়ে কঠিন সাহসী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। শুনেছি গত সপ্তাহের সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ক্ষেত্রে সরকারের খরচ দেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তাই, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক না দলমত নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল নাগরিকের সমর্থনই প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য।

(লেখক বিজেডি-র সংসদ সদস্য)

কর্মখালি

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশনা, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীকে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী সভাসমিতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে।

১. **অফিস ম্যানেজার :** প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই এমবিএ (রেগুলার কোর্স) হতে হবে। সেইসঙ্গে থাকতে হবে বন্ধুভাবাপন্ন এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই সচ্ছন্দ হওয়া ও কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংস্থা প্রার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, দলের একজন হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রত্যাশা করে। প্রথম ছয়মাস অস্থায়ী কর্মী (বেতন ছয় হাজার টাকা) হিসেবে কাজ করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হবে। বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

বিজ্ঞাপন প্রবন্ধক : প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিএ হওয়া আবশ্যক। সেইসঙ্গে থাকতে হবে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রার্থী অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী, ফলাভিমুখী, জনসংযোগে দক্ষ এবং বাংলা ও ইংরেজিতে সমান সচ্ছন্দ ও কম্পিউটারে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং তার প্রকাশনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে প্রার্থীকে দায়বদ্ধ হতে হবে। সংস্থা প্রার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, দলের একজন হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার মনোভাব প্রত্যাশা করে। প্রথম ছয়মাস অস্থায়ী কর্মী হিসেবে (বেতন ৬০০০ টাকা) কাজ করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হবে। বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

দরখাস্ত করুন নীচের ঠিকানায় :—

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, E-mail : swastika5915@gmail.com

নোট বাতিলের ধাক্কায় ধরাশায়ী মোদী-বিরোধী রাজনীতি

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে দেশের রাজনৈতিক মহলেও হাওয়া বদল হতে চলেছে। অনেক পুরনো সমীকরণ যেমন পাল্টেছে তেমনি নতুন সমীকরণও তৈরি হচ্ছে যেগুলির মধ্যে একটি হলো বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অবস্থান বদল। তিনি এই সিদ্ধান্তকে নীতিগতভাবে সমর্থন করেই ক্ষান্ত হননি, প্রধানমন্ত্রীর এমন পদক্ষেপকে স্বাগতও জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে যেসব দল এর বিরোধিতা করছে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে, তিনি কি ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রিত্বের রণে ভঙ্গ দিলেন?

একজন সৎ রাজনীতিক হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরতেই তিনি নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়েছে যে তিনি মোদী বিরোধিতা থেকে সরে এসেছেন যেটা এতদিন পর্যন্ত তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল। এনডিএ-র শরিক থাকাকালীনও তিনি মোদীর কট্টর বিরোধী ছিলেন। সেকারণে বিহার নির্বাচনে জিতে আসার পর তাঁকে মোদীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা হয়েছিল। বিহার বিজেপির বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি সহ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নষ্ট করার অভিযোগ আনলেও জনমানসে এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে তিনি আবারও বিজেপি জোটের দিকেই ঝুঁকছেন। তা যে তিনি বিজেপির সঙ্গে যান বা না যান, আগামী আড়াই বছরে তিনি তাঁর পুরনো ভাবমূর্তি উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে হয় না। জোটকে এভাবে বিপদে ঠেলে দেওয়ায় আর জেডি-কংগ্রেস তাঁর উপর বেজায় চটে গেছে। এনিয়ে লালুপ্রসাদ ও সোনিয়ার মধ্যে কথোপকথনও হয়ে গেছে। বস্তুত মহাজোট বন্ধনের ভিতরের সমীকরণ পাল্টেছে। একদিকে যেমন কংগ্রেস আগামী লোকসভা নির্বাচনে নীতীশকে বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে মেনে নিতে নারাজ তেমনি অন্যদিকে লালুর দলের নেতারা দাবি করছেন যে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হওয়া উচিত অর্থাৎ এবার লালুর ছেলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত। তাই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের দাবি নীতীশের সামনে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। নীতীশের প্রধানমন্ত্রিত্বের পথে মোদীজী সবচেয়ে বড় বাঁধা হলেও রাহুল গান্ধী কোনো অংশে কম বড় বাধা নন। সেটা বুঝেই তিনি মোক্ষম চাল দিয়েছেন। একদিকে বিহারে মদ নিষিদ্ধ করার মতো সামাজিক সংস্কার আর অন্যদিকে নোট বাতিলের মতো অর্থনৈতিক সংস্কারকে সমর্থন করে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নেতা হয়ে উঠতে পারবেন বলে তিনি মনে করছেন।

নোট বাতিলের বিরুদ্ধ হাওয়াকে কাজে লাগাতে বিরোধীরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। মায়াবতী, অখিলেশ যাদব, মুলায়ম সিং, লালুপ্রসাদ, বামফ্রন্ট এমনকী এনডিএ শরিক শিবসেনাও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু প্রধানত তিনজন নেতা-নেত্রী নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে বিরোধী জোটের মুখ হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন। এঁরা হলেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

পোড়খাওয়া রাজনীতিক নরেন্দ্র মোদী ভালভাবেই জানেন বিরোধীরা একজোট হতে পারবে না। রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একলা সাক্ষাৎ করায় মোদী-বিরোধী শিবির অনেকটাই ছন্নছাড়া। নোটবাতিল কাণ্ডে বিজেপি যে বিরোধীদের অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে তা অল্পদিনেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

মমতা ব্যানার্জী। আর এটা কোনো কাকতলীয় ঘটনা নয়। ২০১৪-র মতো ২০১৯ এও মোদীজীই অবধারিত ভাবে লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হবেন। যিনি নিজেকে সবচেয়ে বেশি মোদী বিরোধী প্রমাণ করতে পারবেন তাঁর পালেই সবচেয়ে বেশি বিজেপি বিরোধী ভোট যাবে। তাই এই তিন রথীর মধ্যে মোদী বিরোধী রাজনীতির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। আগামী দু' বছরের মধ্যে যেসব বিধানসভা নির্বাচন হবে তাতেই এঁদের একজনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

নোট বাতিল ঘোষণার পর মহারাষ্ট্রে কিছু আঞ্চলিক নির্বাচন হয়ে গেছে। গ্রাম-শহর মিলিয়ে ১৭৪টি সমিতির নির্বাচন হয় যাতে বিজেপি ৫৫টিতে এককভাবে জিতে প্রথম হয়েছে। বিজেপি-শিবসেনা জোট দ্বিতীয় হয়েছে। কংগ্রেস ও এনসিপি যথাক্রমে তিন ও চার নম্বরে রয়েছে। ফলাফলে স্পষ্ট যে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে একটা বড় সড় বদল হয়েছে। ছত্রভঙ্গ কংগ্রেস ও এনসিপি আবার একজায়গায় আসতে চাইছে। আগামী বছর মুম্বই পৌর নির্বাচনে সম্ভবত তারা একসঙ্গে লড়বে। লক্ষণীয় যে, শিবসেনা কিন্তু বিজেপি জোটেই রয়েছে আর কংগ্রেস ও এনসিপির মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়নি। এতে শরদ পাওয়ারের এনসিপি-র বিপুল ক্ষতি হয়েছে। পাঁচ বছর আগে তারা যেখানে সবচেয়ে বেশি আসন জিতেছিল এবার সেখানে তারা চারে নেমে এসেছে।

অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সেই জায়গায় ফিরে গেছে যেখান থেকে গত জুলাই য়ে তারা নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিল! তারা যতই বোঝাতে চায় যে এবার কংগ্রেসের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে, বাস্তবে কিন্তু গত পাঁচ মাসে তাদের উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাদের রণকৌশল তৈরির দায়িত্বে থাকা প্রশান্ত কিশোরও আগ্রহ হারিয়েছেন। একদিকে রাজ্য কংগ্রেস নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে হাইকমান্ডকে লাগাতার নালিশ জানাচ্ছেন আর অন্যদিকে কংগ্রেস থেকে তিনি তাঁর পাওনাগণ্ডাও পাচ্ছেন না। এসবের জেরে তিনি উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিয়েছেন। পার্টি নেতারা স্বীকার করছেন যে গত ছয় মাসে কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে যতটুকু প্রচারের আলো পেয়েছিল সে সবই প্রশান্ত কিশোরের দক্ষতার কারণে। এখন রাহুলের কিষানযাত্রা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী শীলা দীক্ষিত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা নেতা গুলাম নবি আজাদ আজকাল সংসদ বিষয়ক ব্যাপারে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রাজ্যসভাপতি রাজবব্বর কিছুটা সক্রিয় আছেন যাতে বিশেষ কিছু একটা হেরফের হচ্ছে না। সেখানে কংগ্রেসের হাল এতটাই করুণ যে অখিলেশ যাদব একটা অস্পষ্ট জোটের ইঙ্গিত দেওয়াতে তারা ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।

এদিকে পঞ্জাবে রাজনীতির প্রবণতাকে মাথায় রেখে এবার বিজেপি-অকালি দল তাদের ক্ষমতা হারানোর বিষয়টা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু চণ্ডীগড়ের সাম্প্রতিকতম পৌরভোটের ফলাফল হিসেব পাল্টে দিয়েছে। ২৬টির মধ্যে ২১টিতেই বিজেপি জোট জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৪টি আর নির্দল ১টি আসন। শুধু তাই নয়, বিজেপি তাদের হারানো আসনের মধ্যে ১০টি ফিরে পেয়েছে। ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ইস্তফা দেওয়ায় অমৃতসর আসন খালি রয়েছে। আগামী বছর পঞ্জাব বিধানসভা ভোটের সঙ্গে ওই আসনেরও উপনির্বাচন হবে। ২০১৪-র লোকসভা ভোটে বিজেপি-অকালি জোটের প্রার্থী হিসেবে অরুণ জেটলি এখান থেকে হেরেছিলেন। স্বভাবতই এই আসনের গুরুত্ব অনেক। এবার জেটলির লড়ার সম্ভাবনা কম। সবার চোখ এই আসনে, কেননা অমরিন্দর সিং এখন কংগ্রেসের অঘোষিত মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। আর সিধু যদি ওই আসনে লড়েন তবে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় জিততে পারেন। এবার তাঁর পেছনে বিজেপি নেই। 'আপ' এবার পঞ্জাবের ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া। সেখানে তাদের পায়ের নীচের মাটি কিন্তু আলগা হতে শুরু করেছে।

এক কথায় কিছুদিন আগে পর্যন্তও মোদী বিরোধী জোটকে যেখানে শক্তপোক্ত দেখাচ্ছিল, নোট বাতিলের ধাক্কায় তা একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। এই ইস্যুতে অখিলেশ-অরবিন্দ-রাহুলরা মমতাকে সমর্থন করলেও উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পঞ্জাবে তাঁরা যে তাঁকে একপা মাটিও ছাড়বে না তা গত কয়েকদিনে তাঁদের আচরণে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষত, রাহুল-অরবিন্দরা কোনো মতেই তাঁকে ২০১৯-এ বিরোধী জোটের মুখ হয়ে উঠতে দেবেন না। কথাগুলো আদ্যন্ত পোড়খাওয়া রাজনীতিক নরেন্দ্র মোদী ভালোভাবেই জানেন। এই রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে পরোক্ষে মমতার প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিকে উস্কে দেওয়া হয়েছে। নোট বাতিলের বিরুদ্ধে সংসদ অচল করা ছাড়া বিরোধীদের হাতে যে বড় কোনো অস্ত্র নেই তা আগে থেকে মেপে নিয়েই মোদীজী পা ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন 'কিছুলোক' এর বিরোধিতা করছে, কারণ সরকার তাদের প্রস্তুতির জন্য (কালোটাকা সাদা করার) কোনো সময় দেয়নি। এই কথা নিয়ে বিরোধীরা ঝড় তুললেও বাস্তবে কিন্তু সেটাই প্রমাণ হয়ে গেছে। তৃণমূল বা আপের আন্দোলনের ভাষা থেকে এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে যে তাদের জনপ্রিয়তা হিসাব বহির্ভূত নোটের বান্ডিলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগামী দিনে এঁদের রাজনীতি করাটা যে কঠিন হতে যাচ্ছে তা জোর দিয়ে বলা যায়। সংসদ অধিবেশনকে পুরো ভেস্তে দিয়ে শেষবেলায় অপরিণত রাজনীতিক রাহুল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একলা সাক্ষাৎ করায় মোদী বিরোধী শিবির পুরোপুরি পথে বসে গেছে। তাই নোট বাতিল কাণ্ডে বিজেপি যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তা অল্পদিনেই প্রমাণ হয়ে যাবে। ■

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ গোটা অঞ্চলের জন্যে বিপদ ডেকে আনবে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবাধ প্রবেশ শুধু এদেশে নয়, গোটা অঞ্চলে ইসলামি জঙ্গি তৎপরতাকে মদত দেবে। রোহিঙ্গা পরিস্থিতি ব্যবহার করে আশির দশক থেকে এখানে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক কয়েকটি বেসরকারি ইসলামি সংস্থা (এনজিও) তৎপরতা চালাচ্ছে। পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই বলতে গেলে কক্সবাজারে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। মালয়েশিয়া, ভারতের কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনও তৎপর। বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামি মূল সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছে। সঙ্গে আছে বিএনপি ও আওয়ামি লিগের একটি অংশও।

রোহিঙ্গাদের নতুন করে আগমনে উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখার জন্যে আমি সম্প্রতি কক্সবাজার যাই। টেকনাফ ও উখিয়াসহ আশেপাশের এলাকা পরিদর্শন করি। আমি যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছি তা নিম্নে তুলে ধরছি :

রোহিঙ্গাদের প্রবেশ

৬ নভেম্বরের পর থেকে প্রতিদিনই রোহিঙ্গা মুসলমানরা প্রবেশ করছে। বিজিবি-কোস্ট গার্ড বাধা দেওয়ার কথা বললেও দালালদের সহায়তায় মূলত রাতের অন্ধকারে (রাত বারোটা থেকে তিনটার মধ্যে) রোহিঙ্গারা ঢুকে পড়ছে। সাধারণত দেখা যায়, ১৫/২০টা নৌকা নাফ নদী দিয়ে এলে বিজিবি-কোস্ট গার্ড কিংবা পুলিশ তাড়িয়ে দিলেও সুযোগ বুঝে কয়েকটা নৌকা ঢুকে পড়ছে। রাখাইনে মায়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের হিসেবে ১০ থেকে ১২ হাজার রোহিঙ্গা কক্সবাজারে এসেছে বলা হলেও বিভিন্ন সূত্রে এ সংখ্যা ৭০ হাজারের ওপরে বলা হয়েছে।

রোহিঙ্গারা কক্সবাজারে এসে নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নিলেও পরে গোটা জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে। আশেপাশের অন্য জেলায়ও। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক হচ্ছে রাঙামাটি, বান্দরবনে নতুন করে হুমকি তৈরি হচ্ছে জনজাতিদের জন্যে। জনজাতিরা এমনিতেই নিজভূমে এখন পরবাসী, পার্বত্য জেলায় জনজাতি-বাঙালি প্রায় সমান। রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি জনজাতিদের আরও বিপন্ন করবে। বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা বাড়বে। রোহিঙ্গাদের আলাদাভাবে চেনার কোনো উপায় নেই। কারণ তারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মতোই, কথা বলে চট্টগ্রামের ভাষায়। কাজেই জনসাধারণের মাঝে মিশে যাওয়া অত্যন্ত সহজ।

শরণার্থী শিবির পরিস্থিতি

টেকনাফে ২টি ও উখিয়ায় ১টি

নদীপথে এভাবেই ঢুকে পড়ছে রোহিঙ্গারা।

সরকারিভাবে নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির রয়েছে। টেকনাফে নয়াপাড়া ও লেদায় এবং উখিয়ায় কুতুপালংয়ে নিবন্ধিত শিবিরগুলোতে হাজার কুড়ির মতো থাকার কথা থাকলেও প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। লেদায় অনিবন্ধিত শিবির আছে একটি। কুতুপালংয়ে আছে একটি। দুটোতেই ২০/২২ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান শরণার্থী থাকে। এছাড়া আরও কয়েকটি অঘোষিত শরণার্থী শিবির আছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে সহায়তা আসে মুসলিম এইড সংস্থা-সহ মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক কয়েকটি এনজিও এবং ইউএনএইড থেকে। ইউএনএইড-এর সহায়তা দেওয়া হয় মূলত নিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে নিবন্ধিত শরণার্থীদের জন্যে।

শরণার্থী শিবিরের বাইরে

কক্সবাজারের বাইরে অনেক এলাকায় এখন স্থানীয়দের চাইতে রোহিঙ্গা মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এলাকাগুলো হচ্ছে টেকনাফ পাহাড়, এবিসি ঘোনা, ফাতের ঘোনা, পাহাড়তলি, গোনার পাড়া, বৈদ্যর ঘোনা, সমিতি পাড়া, কলাতলি ও জেলগেট এলাকা। রোহিঙ্গাদের আসা শুরু হয় ১৯৮০ সালে। স্থানীয়দের কাছে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৯৯২ সালের মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসে। স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশা এবং বিয়ের ফলে বাংলাদেশের জনস্রোতে তারা মিশে যায়। এ পর্যন্ত পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে বলে ধারণা করা হয়। কেউ কেউ এদেশে চলে আসা রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ছ'সাত লাখেরও বেশি বলে মনে করেন। তারা ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের বাইরেও। বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশেও। বিভিন্ন দেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তারা জড়িয়ে পড়ছে। কিছুদিন আগে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় রোহিঙ্গাদের অংশগ্রহণের কথা জানা গেছে। রোহিঙ্গাদের নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়ছে।

রাজনীতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে রোহিঙ্গারা

রোহিঙ্গা মুসলমানদের রাজনীতিতে ব্যবহার করছেন রাজনীতিকরা। এ ব্যাপারে আওয়ামি লিগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি ও অন্য ইসলামি দলগুলোর মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা রয়েছে। তবে রোহিঙ্গারা সবচেয়ে বেশি কাজ করে জামায়াতে ইসলামি ও বিএনপির সঙ্গে। রামুর ঘটনায় দেখা গেছে, বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ পাড়াগুলোতে হামলা ও অগ্নিসংযোগে স্থানীয় কিছু ব্যক্তির সঙ্গে রোহিঙ্গারাও যোগ দেয়। এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় জামায়াত নেতা তোফায়েল। অভিযোগ, রোহিঙ্গাদের বলা হয়েছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিতে পারলে সেই জায়গাগুলো রোহিঙ্গাদের দেওয়া হবে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে রোহিঙ্গাদের কাজে লাগানো হয়। তাদের অনেকে রাজনীতিকদের সহায়তা নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইডি কার্ডও হয়েছে তাদের।

জঙ্গিবাদী সংগঠনের বিকাশ

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আর এস ও) রোহিঙ্গাদের বেশ সংগঠিত সংগঠন। মিয়ানমারের রাখাইনে ওরা প্রকাশ্যেই কাজ করে। তবে কক্সবাজারে কিংবা বাংলাদেশে কাজ করে ততটা প্রকাশ্যে নয়। জানা গেছে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামি তাদের সহযোগিতা করে। আওয়ামি লিগ নেতারাও যুক্ত। তবে বান্দরবনের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় আরএসও'র তৎপরতা বেশি। এখানে নেতৃত্বে আছেন আওয়ামি লিগের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক শফিউল্লাহ ও জামায়াত নেতা তোফায়েল আহমেদ, প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান। টেকনাফে আর এস ও'র দুই বড় নেতা হচ্ছেন বাহারছড়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মওলানা আজিজউদ্দিন ও তার ছোট ভাই মওলানা রফিকউদ্দিন। আজিজউদ্দিন আওয়ামি লিগের মনোনয়নে জয়লাভ করেন। তিনি কক্সবাজার আওয়ামি ওলামা লিগের সভাপতি। জানা গেছে, এই জঙ্গি তৎপরতায় মূলত আর্থিক সহায়তা আসে সৌদি আরব, দুবাই ও কুয়েত থেকে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে। অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের মধ্যে অপরিচিত কিছু লোককে টাকা-পয়সা বিতরণ করতে দেখেছ কী। এমনকী তারা মাঝে-মধ্যে শরণার্থী শিবিরে এসেও টাকাপয়সা দিয়ে যায়। স্থানীয় ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে জানান, আরএসও নেতারা তাদের পরিচয় গোপন রেখে এই টাকাপয়সা বিতরণ করেন। একাজ সংগঠিত করছে আইএসআই।

বাইরের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ

কক্সবাজারে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে আমাকে বলেন, ভারতের কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদিন (এইচএম) ও আফগানিস্তানের গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলামি (এইচইএল) এবং মালয়েশিয়ার আংকাতান বেলিয়া ইসলাম (এবিআইএম) ও ইসলামিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সহায়তা পাচ্ছে আরএসও। বাংলাদেশের জেএমবি'র কথাও এসেছে। এই যোগাযোগের কথা বাংলাদেশ সরকার জানে না এমন নয়। কিন্তু সক্রিয় কোনো ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না।

রাখাইনে আর্মি ক্যাম্পে হামলা

জানা গেছে, টেকনাফে আনসার ক্যাম্পে হামলা করেছিল আরএসও। আনসার কমান্ডার খুন হন, লুট হয় ১৬টি রাইফেল ও পাঁচ শতাধিক গুলি। গত ৬ নভেম্বর রাখাইন প্রদেশে আর্মি ক্যাম্পে আরএসও যে হামলা চালায় তাতে এই আনসার ক্যাম্প থেকে লুট করা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

গভীর জঙ্গলে প্রশিক্ষণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে গত তিন দশকে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইসলামি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির। জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই শিবিরগুলো পরিচালনা করছে। রোহিঙ্গারাও এসব শিবিরের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেদন বেরোলে মাঝে মধ্যে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শিবিরগুলো যথারীতি আবার চালু হয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। ■

অন্যরকম

নিহত জঙ্গিদের অনাথ সন্তানের জনক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ খবরটা কয়েক বছর আগেকার। কিন্তু সে সময় খুব বেশি মানুষ লক্ষ্য করেননি। ফেসবুকে পোস্ট করে কেউ জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জঙ্গিদের ২০০ জন কন্যাসন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের এক যুবক। অনাথ শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা যেমন তিনি করেছেন, তেমনই করেছেন লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থাও। খবরের সঙ্গে ছিল সদ্য হাঁটতে শেখা একটি মেয়ের ছবি। নাম শাজিয়া খান। ২০০৭ সালে শাজিয়ার জিহাদি বাবা যখন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় তখন তার মা তাকে কুপওয়ার একটি হোমে রেখে গিয়েছিল। কাশ্মীরের কঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একলা মায়ের পক্ষে মেয়েকে বড়ো করা সবসময়েই কঠিন। তাই শাজিয়ার মা হোমের শরণাপন্ন হয়েছিল।

শাজিয়ার এখন ১৯ বছর বয়েস। মহারাষ্ট্রে থাকে। ডাক্তারি পড়ে। কিন্তু এই নিবন্ধ তাকে নিয়ে নয়। বরং তাঁকে নিয়ে যিনি সেই ৯০-এর দশকে জঙ্গিহানায় উত্তাল কাশ্মীরের ঠিক বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে একটি অন্যরকম পৃথিবীর কথা ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম অধিক কদম। জীবনে আশা আর হতাশার পার্থক্যটা যে শাজিয়ারা বুঝতে পারল তার কারণ এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম.এ। কৃষকের সন্তান অধিক ৯০-এর দশকে ১৫ দিনের জন্য কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে চারমাস ছিলেন। তখনই চাক্ষুষ করেন রক্তাক্ত কাশ্মীরের দুর্দশা। অধিক বলেন, 'চোখের সামনে বহু লোককে খুন হতে দেখেছি। জঙ্গি হামলায় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় শিশুদের। ওদের তো কোনো দোষ নেই। তখনই ঠিক করেছিলাম ওদের জন্য কিছু করব।' অতঃপর তিনি বর্ডারলেস ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশনের (বি ডব্লিউ এফ) প্রতিষ্ঠা করেন। চলতি কথায় যার হোম। কাশ্মীরের কুপওয়ারায় যার কেন্দ্র।

কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। অধিক অনাথ শিশুদের দেখাশোনা করতে চান শুনে স্থানীয় এক মৌলবি ফতোয়া জারি করেছিল। তার আপত্তি, অধিক একে হিন্দু তার ওপর মরাঠি। বাল থ্যাকারের লোক হওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং এখনই মেরে তাড়াও। আবার গুপ্তচর ভেবে জঙ্গিরা তাঁকে অপহরণ করেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। বস্তুত তাঁকে ১৫ বছরে ১৯ বার অপহরণ করা হয়েছে কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি। কারণ তাঁর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা। অধিক বলেন, 'স্থানীয় মানুষের সাহায্য না পেলে আমি এগোতে পারতাম না। ওরা আমায় টাকাপয়সা দিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে সবরকম ভাবে সাহায্য করেছে।'

হোমের মেয়েদের সঙ্গে অধিক কদম।

মাত্র চারটি মেয়েকে নিয়ে হোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন হোমের সদস্যসংখ্যা ৫২। তাদেরই একজন ১৬ বছরের রাজিয়া মালিক বলে, 'আমার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর আমি আশ্রয়ের জন্য আত্মীয়দের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতাম। পড়াশোনায় মন বসত না। মায়ের নতুন বাড়িতেও যেতে ইচ্ছে করত না। যদিও মা আসত।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজিয়ার বাবাও একজন জঙ্গি। বাবার প্রসঙ্গ ওঠামাত্র রাজিয়া চোয়াল শক্ত করে বলে, 'আমার বাবা একজন জঙ্গি এটা আমার সব থেকে বড়ো লজ্জা। আমি বাবার কথা মনে রাখতে চাই না।'

এদের নিয়েই অধিকের সংসার। তাঁর হোমে গেলেই চোখে পড়বে কম্পিউটার রুম, বাগান, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক মেয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশি-বিদেশি বহু প্রতিষ্ঠান অধিকের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। এগিয়ে এসেছেন অনেক সাধারণ মানুষও। ফলস্বরূপ অনন্তনাগ, বিরওয়াহ্ এবং জম্মুতেও হোম চালু করেছেন অধিক। কুপওয়ারার হোমের কাছেই চালু হয়েছে কাশ্মীরের একমাত্র মহিলা-পরিচালিত বিপণন কেন্দ্র। সেখানে অধিকের মেয়েরা নিজেদের তৈরি স্যানিটারি ন্যাপকিন, এমব্রয়ডারি করা জামাকাপড় এবং ফেব্রিক পেন্টিংস বিক্রি করেন। মেয়েদের কথা বলার সময় অধিককে খুব তৃপ্ত দেখায়, বলেন, 'ছোটবেলায় যখন আসে আমি ওদের জামাকাপড় কেচে দিই, চুল আঁচড়ে দিই। আমি ওদের বন্ধু দাদা শিক্ষক...সব। ওদের মধ্যে যখন কেউ বিয়ে করে চলে যায় তখন মনে হয় ওদের বাবাও বোধহয় আমিই! জন্ম দিইনি তো কী, বড়ো তো করেছি।' ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

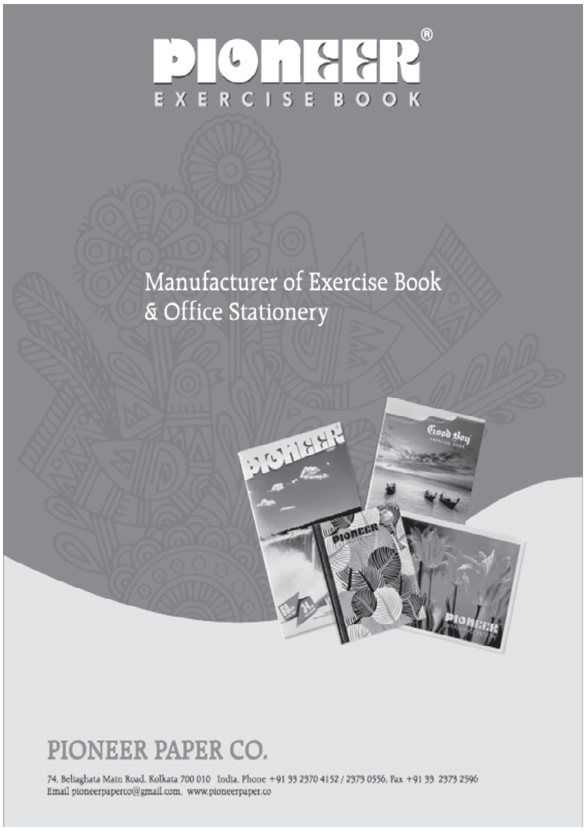

“প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে তার নিজস্ব ভাষায় জীবনের লক্ষ্যে কী করে পৌঁছানো যায়, সেকথা বলে দেবার জন্য কালীমন্দির উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন মূর্ত বিগ্রহ ধারণ করেছেন।
বস্তুত তাঁর ধর্মসংস্কৃতি এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যে যুক্তিবাদী মন তা অনুধাবন করতে পারে।”

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

উপকারী সবজি ব্রকোলি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এক বড়ো কাপ ভাপে সেদ্ধ ব্রকোলি অর্থাৎ ১৫৬ গ্রাম ওজনের ব্রকোলিতে ফোলেট তথা ফোলিক অ্যাসিড থাকে ৯৩.৯১ মাইক্রোগ্রাম। দিনে যদি দু-বার দু-কাপ ভাপেসেদ্ধ ব্রকোলি একটু তেল নুন দিয়েও খাওয়া যায়, তাহলেও গর্ভাবস্থায় ফোলিক অ্যাসিডের যে চাহিদা তার অনেকটাই পূরণ হয়ে যায়। মশলাপাতি দিয়ে রেঁধে খাওয়ার দরকার নেই।

গর্ভাবস্থায় ব্রকোলি খান। অনেকটা ফোলেট মিলে যাবে। পুরো পুষ্টি যদি পেতে হয় তাহলে ভাপে সেদ্ধ ব্রকোলিই খেতে হবে। আর খাওয়ার সোডা মেশানো জলে ভিজিয়ে রাখার পর ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ব্রকোলি খাওয়া যায় কাঁচাই। এছাড়া ভিটামিন কে থাকে অনেকটা। ১৫৬ গ্রামে ১৫৫.২০ মাইক্রোগ্রাম।

ক্যালসিয়ামের মতোই হাড়ের জন্য জরুরি উপাদান এই ভিটামিন কে। পেটের সন্তান এবং মা দুজনের জন্যই দরকার। ১৫৬ গ্রাম ওজনের ভাপে সেদ্ধ ব্রকোলিতে আয়রন থাকে ১.৩৭ মিলিগ্রাম। ব্রকোলিতে প্রচুর পটাসিয়াম থাকে। তুলনায় সোডিয়াম খুবই কম। ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রকোলি খুব উপকারী। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য একটা সমস্যা। ব্রকোলিতে অনেকটা খাদ্যআঁশ আছে। এই খাদ্যআঁশ খাবার হজম করতে সাহায্য করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এখন পর্যন্ত তিনশোরও বেশি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে উঠে এসেছে, নিয়মিত ব্রকোলি খেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ফেলা যায়। ব্রকোলি খারাপ কোলেস্টেরল কমায়। ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ায়। কোলোস্টেরলজনিত হার্টের অসুখের ভোগান্তি হওয়া আটকায়। ব্রকোলিতে বেশ খানিকটা থাকে গ্লুকোরাফ্যানিন নামে একটি নিউট্রিয়েন্ট তথা পুষ্টিকর খাদ্যাংশ যা ফ্যাটকে এমনভাবে ভেঙে দেয়, সেই ফ্যাট খারাপ কোলেস্টেরল হিসেবে জমতে পারে না। গ্লুকোরাফ্যানিন নামে পুষ্টিকর খাদ্যাংশটি একমাত্র ব্রকোলিতেই পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে। প্রতিদিন খাবার পাতে ভাপে সেদ্ধ ব্রকোলি খেলে ফুসফুসের ক্যানসার, পায়ুপথের ক্যানসার, স্তন ক্যানসারে ভোগার আশঙ্কা কমে। ব্রকোলিতে ক্রোমিয়াম থাকে, যা ডায়াবেটিস রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

ব্রকোলি নিয়মিত খেলে এবং প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রম চালিয়ে গেলে শরীর চট করে বুড়িয়ে যায় না। ত্বকে বয়সের ভার নেমে আসতে পারে না। শরীর থেকে ব্যাপক হারে বিষবর্জ্য সাফসুতরো করে ব্রকোলিতে থাকা গ্লুকোরাফ্যানিন, গ্লুকোনাস্টুরসিয়ান এবং গ্লুকোব্রাসিসিন এই তিন নামের গ্লুকোসাইনোলেট ফাইটোনিউট্রিয়েন্টের বিশেষ মিশ্রণ। যাঁদের শরীরে ভিটামিন ডি-র খামতি রয়েছে তাঁরা ব্রকোলির মতো ভিটামিন এ এবং ভিটামিন কে সমৃদ্ধ খাবার দাবার খেয়ে ভিটামিন ডি-র যথার্থ বিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করতে পারেন।

ব্রকোলিতে থাকা ভিটামিন এ চোখের জন্য উপকারী। এছাড়াও, দুই চোখের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী উপাদান থাকে ব্রকোলিতে। সেগুলি লুটিন এবং জিয়াজানথিন।

১৫৬ গ্রাম ব্রকোলিতে প্রোটিন পাওয়া যায় ৪.৬৬ গ্রাম। কার্বোহাইড্রেট ৮.১৯ গ্রাম। খাদ্যআঁশ ৪.৬৮ গ্রাম। এর মধ্যে দ্রবণীয় খাদ্যআঁশ ২.০৩ গ্রাম। অদ্রবণীয় খাদ্যআঁশ ২.৬৫ গ্রাম। সুগার থাকে ৩.১২ গ্রাম। ফ্যাট ০.৫৫ গ্রাম। ক্যালোরিও খুবই কম, মাত্র ৪৩.৬৮ গ্রাম। ব্রকোলি অনেকেই স্যালাডে কাঁচা খেতে অভ্যস্ত। ১৫৬ গ্রাম ব্রকোলি থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায় ১২৩.৪০ মিলিগ্রাম। উল্লেখ্য, তাপের সংস্পর্শে এলে ভিটামিন সি-র অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। ১৫৬ গ্রাম ভাপে সেদ্ধ ব্রকোলিতে জলীয় পদার্থই থাকে ১৪১.৪৯ গ্রাম। আঁশ থাকে ১.৪৮ গ্রাম। ভিটামিন এ থাকে ২২৮০.৭২ আন্তর্জাতিক ইউনিট। বিটা ক্যারোটিন স্তরেই থাকে ১৩৫৮.৭৬ মাইকোগ্রাম। এছাড়াও থাকে ভিটামিন বি ওয়ান ০.০৯ মিলিগ্রাম। বি টু ০.১৮ মিলিগ্রাম। বি থ্রি ০.৯৪ মিলিগ্রাম। সমতুল আরও ১.৭০ মিলিগ্রাম। ভিটামিন বি সিক্স ০.২২ মিলিগ্রাম। ভিটামিন ই ০.৭৫ মিলিগ্রাম। ফোলেট ৯৩.৯১ মাইক্রোগ্রাম। ভিটামিন কে ১৫৫.২০ মাইক্রোগ্রাম প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ০.৭৯ মিলিগ্রাম। যেসব খনিজ পদার্থ থাকে : ম্যাগনেসিয়াম ৩৯ মিলিগ্রাম। ক্যালসিয়াম ৭৪৭২ মিলিগ্রাম। কপার ০.০৭ মিলিগ্রাম। পটাসিয়াম ৫০৫.৪৪ মিলিগ্রাম। সোডিয়াম ৪২.১২ মিলিগ্রাম। জিঙ্ক ০.৬২ মিলিগ্রাম। আয়রন ১.৩৭ মিলিগ্রাম। ফরফরাস ১০২.৮০ মিলিগ্রাম। সোডিয়াম ৪২.১২ মিলিগ্রাম। জিঙ্ক ০.৬২ মিলিগ্রাম।

আর থাকে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ০.২০ গ্রাম। ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড ০.০৬ গ্রাম। অ্যাসিড থাকে, সেগুলি : অ্যালানিন ০.১৮ গ্রাম। আর্জিনিন ০.২৩ গ্রাম। অ্যাসপারটেট ০.৩৩ গ্রাম। সিস্টিন ০.০৩ গ্রাম। গ্লুটামেট ০.৫৮ গ্রাম। আইসোলিউসিন ০.১৭ গ্রাম। লিউসিন ০.২০ গ্রাম। লাইসিন ০.২২ গ্রাম। মেথিওনিন ০.০৫ গ্রাম। প্রোলিন ০.১৮ গ্রাম। সেরিন ০.১৬ গ্রাম। থ্রিওনিন ০.১৪ গ্রাম। ট্রিপটোফান ০.০৫ গ্রাম। টাইরোসিন ০.১০ গ্রাম। ভ্যালিন ০.২০ গ্রাম। ■

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বহমান নদীর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্য অতি নিবিড়। নদীর ধারায় সভ্যতা পুষ্ট হয়। নগর বা গ্রাম গড়ে ওঠে। স্মরণাতীত কাল থেকে ইতিহাস নদীর এই ধারণ ক্ষমতার সাক্ষী। ভারতীয় সংস্কৃতিও নদীর মতো প্রবহমান। ভারতে বসবাসকারী মানুষের ব্যক্তিপরিচয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই বহমানতার অবদান। ভারত রাষ্ট্র বলতে ভারতের মানুষকে বোঝায়। যে মানবগোষ্ঠী যুগযুগান্ত অতিক্রম করে এক সুনিশ্চিত সংলগ্নতার নিগড়ে বাঁধা। এ কথা অনস্বীকার্য, বহু বিদেশি মত ও তার মতালম্বীরা এই নিগড়কে ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। বরং বিবর্তনের ধারায় তারাই ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতির বহুচর্চিত ব্যাপ্তি এবং গভীরতার একটা ধারণা পাওয়া গেল লোকমন্থন ২০১৬ নামক তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ, শিল্পী এবং সমাজকর্মীরা। উদ্যোক্তা

জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত ও বিদ্বানদের সমাগমে লোকমন্থনের অমৃতধারা

মধ্যপ্রদেশ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান প্রাজ্ঞপ্রভাস। সরস্বতী পূজন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল অধ্যাপক ওমপ্রকাশ কোহলি।

উদ্বোধনী ভাষণে জুনা আখাড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের মন সংহতি, সাম্য আর স্নেহের মাধ্যমে যুক্ত। আমাদের কাছে পৃথিবী একটা পরিবারের মতো, কখনওই বাজার নয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে মূল্যবোধ অনুসরণ করে চলি সেখানে মানুষ থেকে শুরু করে মনুষ্যেতর পশুপাখিরও স্থান আছে।' মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যসরকার চিন্তাজগৎকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এরকম যে কয়েকটি আলোচনার সভার আয়োজন করেছে তার মধ্যে লোকমন্থন ষষ্ঠ। তাঁর দাবি, চিন্তাসমুদ্র মন্থন করে অমৃতের সন্ধান দিতে লোকমন্থন সমর্থ হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হৃদয় স্পর্শ করা বক্তব্য পেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনি। তিনি বলেন, ভারতকে তার নিজস্ব রাষ্ট্রপরিচয় সম্বল করে উঠে দাঁড়াতে হবে কিন্তু ভারতকে না জানলে তা সম্ভব নয়। ভারতের বৌদ্ধিক পরম্পরার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আজকের ভারত মোটেই শূন্যগর্ভ নয়। বস্তুত ভারত একটি বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে। আমাদের একদিকে রয়েছে জীবনের চিরকালীন মূল্যবোধগুলি আর অন্যদিকে হাজার হাজার বছর ধরে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ পরম্পরা। যে পরম্পরায় একাকার হয়ে গেছে বিভিন্ন সময়ে ভারতের বাইরে থেকে আসা নানান মত ও মতাবলম্বীরা। আপাতদৃষ্টিতে নানা বিচিত্র স্রোতের সমাহারে সৃষ্ট বলেই ভারতীয় সংস্কৃতির বহমান ধারাটি এত সংঘাতময়। সুরেশ সোনি বলেন, অজ্ঞতা আর দ্বিধার বুদ্বুদ সরিয়ে আমরা যাতে আমাদের ভাবজগতের ভারতের সন্ধান পাই তার জন্য প্রত্যেককে মানসিক, বৌদ্ধিক এবং নান্দনিক চিন্তাচেতনা গড়ে তুলতে হবে। পরবর্তী বক্তা ছিলেন সাংসদ বিনয় সহস্রবুদ্ধে। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক মানসিকতা বদলাতে

অনুষ্ঠানে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তব্য রাখছেন শিবরাজ সিং চৌহান।

লোকমন্থন সব থেকে ভালো কাজ করে। এর উদ্দেশ্য সারা বিশ্বের ভাবনার দেশীয়করণ এবং ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রের ভাবনা বিশ্বায়িত করার উপযুক্ত পথসন্ধান। সর্বশেষ বক্তা ছিলেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল অধ্যাপক ওপি কোহলি। তিনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার ভুলভাল নীতির ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। তিনি সবাইকে যে-যার শিকড়ে ফিরে আসার কথা বলেন।

উদ্বোধনের পর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। সূচনাপর্বে ভাবনা উদ্রেককারী আলোচনায় অংশ নেন আলোচকেরা। বিষয়, উপনিবেশবাদ, ইউরোপকেন্দ্রিক মেধাচর্চা এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তন। এই পর্বে পৌরোহিত্য করেন পূজ্য স্বামী মিত্রানন্দ। বক্তব্য পেশ করেন রাজীব মালহোত্রা এবং অধ্যাপক রাকেশ সিনহা। পরের পর্বগুলিতে একাধিক যুগন্ধর বক্তার চিন্তামন্থনের ফলে উঠে আসতে থাকে একের পর এক দিক্‌দর্শী ভাবনাগুচ্ছ। মূল বিষয় উপনিবেশবাদ এবং সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তার প্রভাব। সৌভাগ্য, আয়োজকেরা শুধু ভাষণের কথা ভাবেননি। বক্তাদের সঙ্গে শ্রোতাদের নিবিষ্ট কথোপকথনে আলোচনার পরিবেশটি সুচারু হয়ে উঠেছিল। আরও একটা কারণে আয়োজকেরা ধন্যবাদার্হ। প্রথম দিনের শেষেই সকলে অনুভব করতে পেরেছিলেন জীবনের সবক্ষেত্রেই খাঁটি ভারতীয় হয়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব নয়। শুধু ইংরেজিয়ানা নির্ভর ঔপনিবেশিক মনোভাবটি অবিলম্বে ত্যাগ করতে পারলেই ভারতীয়ত্বের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় দিনটি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. বিবেক দেবরায় এবং প্রাক্তন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মুরলীমনোহর যোশীর উপস্থিতিতে জমে উঠেছিল। এদিনের আলোচনার বিষয় ছিল নব্য উদারনীতি এবং বিশ্বায়ণের পটভূমিতে জাতীয়তাবাদ। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অন্য চেহারা। তাঁর মেধা, মনন ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা মুগ্ধ। আজকাল যেসব রাজনীতিবিদ তাদের অসার বাগাড়ম্বরে স্রেফ হাওয়া গরম করেন আর ভারতীয়ত্বের ধারণাটি ক্রমাগত ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমি দুনিয়া আমাদের ওপর যে বাজারতাড়িত অর্থনীতির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে একদিন এক সম্মিলিত বিশ্ব তা মুছে দেবে। ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' সংস্কৃতিই পারে বিশ্বের সেই শূন্যতা পূরণ করতে। ড. বিবেক দেবরায় তাঁর ভাষণে ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে ঐক্যমত্য গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সময়ের দাবি পূরণ করতে না পেরে ফুরিয়ে যাওয়া যাবতীয় বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ এবং সামাজিকতা ত্যাগ করে আমাদের এখন একজন ভারতীয় হবার জন্য গর্ববোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। ড. মুরলী মনোহর যোশী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতায় শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ভারতের মৌলিক রূপটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত একাই সমগ্র বিশ্বজুড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন ভারতের প্রতিটি মানুষ নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হবে এবং তা প্রয়োগ করবে। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আধুনিক মানুষের তুলনায় সমাজবদ্ধ মানুষের সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিযোজন অনেক বেশি। এই পর্বে ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক প্রসন্ন দেশপাণ্ডে লিখিত 'ডিসইন্ডিয়ানাইজিং ইন্ডিয়ান্স--- দ্য মেটাফিজিক্স অব অ্যাকাডেমিক লেফ্ট' বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন ড. মুরলীমনোহর যোশী।

মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এরপর শুরু হয় একাধিক আলোচনা সভা। কোথাও বিষয় জাতীয়তা ও আধুনিকতা, আবার কোথাও, আধুনিকতা ও জীবনশৈলী।

সামধং রিন্‌পোচেকে স্বাগত জানাচ্ছেন সুরেন্দ্র পাটোয়া।

প্রতিবেদন পেশ করছেন জে. নন্দকুমার। পাশে ড. রাকেশ সিন্‌হা।

এইভাবে ধাপে ধাপে হয়েছে বর্তমান বিশ্বের চালচিত্র ও ভারতের ভূ-রাজনীতি, দেশীয় অর্থনীতিতে সংস্কৃতির ভূমিকা এবং জাতীয়তায় পরম্পরা ও ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা। সারা পৃথিবী থেকে আমন্ত্রিত বক্তারা তাঁদের জাদুকরি বাগ্মিতায় প্রতিটি শ্রোতার মনে চিত্রবিচিত্র মুগ্ধতা বুনে দিতে সক্ষম হন। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং কলাম লেখক তারেক ফতেহ্। তিনি ইসলাম ধর্মের মৌলবাদী স্বরূপ এবং রাজনৈতিক ফয়দা তোলার ব্যাপারে মুসলমানদের কাঙালপনার অন্তর্নিহিত কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণতা এবং শ্লেষে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ইসলামি দুনিয়া। তিনি ভারতের সার্বিক রাষ্ট্রপরিচয় গঠন এবং প্রতিবেশী দেশগুলির অশুভ বাসনা ধ্বংসের ওপর জোর দেন। দলিত চেম্বার অব ইন্ডিয়ান কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন মিলিন্দ কাম্বলে মনোগ্রাহী ভাষণে দলিতদের জন্মপরিচয়ের আমূল সংস্কারের ফলে তাদের কত ক্ষতি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। তবে তিনি এও জানান, সহযোগিতামূলক সামাজিকতা আগের থেকে উন্নত হওয়ায় দলিতদের আর্থিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের পথ আরও সুগম হয়েছে।

এদিনের পরের পর্বের আলোচনার বিষয় ছিল একটু ভিন্নধর্মী। মূল বিষয় ছিল, জাতীয় পরিচয় ও ব্যক্তিগত পরিচয়, নারীর ক্ষমতায়ণ ও নারীবাদের পশ্চিমি তত্ত্ব, দলিত আত্মপরিচয়, উত্তরপূর্বাঞ্চল, জম্মু-কাশ্মীর ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ। বিভিন্ন আলোচকের বিশ্লেষণে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কথাকলি, কালারি, ভরতনাট্যম্ প্রদর্শন করেন শ্রীকলামণ্ডলম্ প্রভোষের শিল্পীরা।

লোকমন্থনের তৃতীয় দিনের অভিজ্ঞতা এক কথায় বর্ণাঢ্য। প্রথম পর্বে শিল্পসংস্কৃতির ভূমিকা নিয়ে অসাধারণ আলোচনা করেন কালাপিনি কোমাকালী। তাঁর চিন্তার গভীরতা এবং নান্দনিক প্রকাশভঙ্গী শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। ড. কপিল তেওয়ারি সনাতন প্রতীকসমূহের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভারতের সুবিশাল ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। ড. সোনাল মান সিং বলেন, আগামীদিনে যে ভারত গড়ে উঠবে সেখানে কোনো লিঙ্গবৈষম্য থাকবে না। মেয়েদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে জাতিসত্তা নির্মাণও অধরা থেকে যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিন দিনের লোকমন্থন ২০১৬-র একেবারে শেষলগ্নে পাওয়া গেল অনুপম খেরকে। বলিউডের বর্ষীয়ান এই অভিনেতা ভারতের পারিবারিক সংস্কৃতিতে বাবা-মা'র চিরভাস্বর ভূমিকার কথা বলেন। তাঁর মতে বাবা-মার প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাই মানুষকে তার শিকড়ের কাছাকাছি রাখতে পারে। বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠার অজস্র অভিজ্ঞতা শ্রোতাদের কাছে বর্ণনা করে অনুপম খের বলেন, বাবা-মাকে শ্রদ্ধা না করলে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা করার অধিকার অর্জন করা যায় না। পরের বক্তা ছিলেন তিব্বতের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সামধং রিনপোচে। তিনি বলেন, সংস্কৃতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঔপনিবেশিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না ভাষাকে মুক্ত করা হচ্ছে। যেহেতু ভাষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ভাষার ওপরেই বর্তায়। সুতরাং ভাষাসংস্কার একান্ত ভাবে জরুরি। তিনি বলেন, আমরা যদি আরও বেশি প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবনযাপন করি তা হলে আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তার পুনর্জাগরণ ঘটবে। কারণ প্রকৃতি কখনও ঔপনিবেশিকতার আড়ালে ঢাকা পড়ে না।

সব শেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-প্রচার প্রমুখ জে. নন্দকুমার লোকমন্থন ২০১৬-কে ভিত্তি করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। পরে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী-সহ লোকমন্থনকে যারা সমর্থন করেছেন, এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, রাজা ভোজের তত্ত্বাবধানে একদা ভারতে যে গরিমাময় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এখনও তার অংশবিশেষ এই ভোপাল শহরে দেখতে পাওয়া যায়। এই শহর ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিতে ভালোবাসে। এখানকার মানুষও তাদের অতিথিবাৎসল্য এবং উদারতার কারণে সুপরিচিত।

তিন দিনের লোকমন্থন ২০১৬-তে সারা ভারতের জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের আলোচনায় বারে বারে যে বৌদ্ধিক, নান্দনিক এবং দার্শনিক উপলব্ধির কথা উঠে এসেছে তাই লোকমন্থন থেকে পাওয়া অমৃতধারা। আমাদের সৌভাগ্য এই অমৃত পান করা যায় এবং সঞ্জীবিত করে তোলা যায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে।

লোকমন্থনের বিদায়ী ভাষণ দেন বর্ষীয়ান অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার ও চিত্রনির্মাতা চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সবথেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো সংস্কৃতি। কারণ জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতি একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের নির্মাণশৈলীতে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়।

শীত পড়তেই দিকে দিকে নাট্যমেলা

নান্দীকারের 'মাধবী' নাটকের দৃশ্য।

বিকাশ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের মতো নাটক নিয়ে এতো মাতামাতি দেশের আর কোথাও নেই। শীত পড়তেই বাংলার দিকে দিকে নাট্যোৎসবের আয়োজন তাই চোখে পড়ার মতন। কলকাতায় মধুসূদন মঞ্চের নবরূপায়ণে ব্রাত্যজনের নাট্যোৎসব হয়ে গেল ১৩ থেকে ২৪ নভেম্বর। উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। ১৩ তারিখ অর্থাৎ উদ্বোধনের দিন সম্মানিত করা হয় মফস্সলের কৃতী নাট্যজনদের। ব্রাত্যজনের পক্ষ থেকে ব্রাত্য বসু বলেন, এঁদের সম্মানিত করার মাধ্যমে ব্রাত্যজনই সম্মানিতবোধ করছে। বিভাস চক্রবর্তী বলেন, ব্রাত্য ঈর্ষণীয়ভাবে নাটক রচনা ও নির্দেশনার পাশাপাশি আরও বিস্তৃতভাবে থিয়েটারের কাজ করে চলেছে। একজন সংগঠক হিসেবে যা শ্লাঘায় বিষয়।

গত ২ ডিসেম্বর উদ্বোধন সারা হলো পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ষোড়শ নাট্যমেলার। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী যোগেন চৌধুরী। এবার নাট্যমেলায় মোট ১৭৫টি নাট্যদল অংশ নিয়েছিল। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় এবং তারপর ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতার বাইরে। নৈহাটি, পানিহাটি, কোলাঘাট, দিনহাটা, বক্রেশ্বর, মালদহ ও বাটানগর। এসেছিল মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর, এলাহাবাদের নাট্যদল। আজ নাট্যমেলা কেবল কলকাতাকেন্দ্রিক নয়। এর শিকড় ছড়িয়েছে অন্য রাজ্যেও। ফলে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ জড়িয়েছে নাট্যমেলার সঙ্গে। পাশাপাশি নাট্যদলগুলিকে যে সম্মানিক দেওয়া হত তাও বেড়েছে। রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণের মুক্তমঞ্চে লেটো, বোলান, গম্ভীরা, পালোটিয়া, চোরচুরনি প্রভৃতি লোকনাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে অন্তরঙ্গ থিয়েটার। এছাড়া গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এক অনবদ্য প্রদর্শনী। নাট্য আকাদেমি পত্রিকার এবারের বিষয় ছিল শম্ভু মিত্র। এবার নাট্যমেলায় রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ ও মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শক সমাগমও চোখে পড়ার মতো। আর সব প্রেক্ষাগৃহেই প্রবেশ অবাধ।

বাংলার সবচেয়ে পুরনো নাট্যোৎসব নান্দীকারের জাতীয় নাট্যমেলা। এবছর ৩৩তম উৎসব। একসময় সারাদেশের নাটকের গতিবিধি জানতে নান্দীকারের উৎসব দেখতেই হোত। রাত থেকে লাইন দিয়ে উৎসবের টিকিট জোগাড় করতে হোত। এখন অবশ্য সেই মাতামাতি চোখে পড়ে না। বিজয় তেন্ডুলকর, কানহাইয়ালাল, রতন থিয়াম, পানিক্কর, করন্থ, সুলভা দেশপাণ্ডে, সুবোধ পট্টনায়ক প্রমুখের কাজের সঙ্গে পরিচয় নান্দীকারের উৎসবেই। 'চরণদাস চোর' দেখাও এই উৎসবেই। এবার ১৬ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১০ দিনে মোট ২৩টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ছিল অসম, বিহার, দিল্লি, কর্ণাটক, মণিপুর ও ওড়িশার নাটক। উৎসবে এবার তারুণ্যের জয়গান।

সারা পৃথিবীতে নাটক আর নাট্যকর্মীদের ওপর যে নিপীড়ন চলছে— তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ— তা নিয়ে প্রদর্শনীর রূপকার তরুণ রুদ্ররূপ মুখোপাধ্যায়। সাবিত্রী ও কানহাইয়ালালের পুত্র হেইমনাম তোম্বার নির্দেশনায় কলাক্ষেত্র নাট্যগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে মঞ্চস্থ করল 'হাংরিস্টোন'। ছিল অসমের পাকিজা বেগম, বিহারের রণবীর কুমার, কলকাতার অনির্বাণ ভট্টাচার্য, মোহিনী সেনগুপ্ত নির্দেশিত নাটক। ছিল বিডন স্ট্রিট শুভমের ছোটদের নাটকও।

বহরমপুরের ঋত্বিক প্রতিবছর 'দেশ বিদেশের নাট্যমেলা' করে। এবার তাদের ১৬ বছর। ৯ থেকে ১৯ ডিসেম্বর মোট ১৭টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে বহরমপুরের রবীন্দ্রসদনে। ঢাকা থেকে এসেছিলেন আতাউর রহমান তাঁর 'নারীগণ' নাটক নিয়ে। ওদিকে মুর্শিদাবাদের রবীন্দ্র ভবনে ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর নাট্যম বলাকার 'নাট্যদর্শন ২০১৬' মঞ্চস্থ হয়। মোট ৯টি নাটক অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরায় উত্তর ফাল্গুনী গোষ্ঠী তাদের 'নটী বিনোদিনী' নাটক মঞ্চস্থ করেছে ১৮ ডিসেম্বর। কোচবিহারের থিয়েটার ইউনিট নাট্যোৎসবে দুদিনে ছোট নাটক ও অণুনাটক মিলিয়ে মোট ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ হলো। উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক প্রবালকান্তি ঘোষ। কান্দির হ্যালিফক্স ময়দানে ২৫ থেকে ৩১ডিসেম্বর 'সারাবাংলা নাট্যোৎসব ২০১৬' মোট ১৩টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসবের আয়োজক ঝড় নাট্যগোষ্ঠী। ঢাকা থেকে কুরশেদউল আলম এনেছিলেন তাঁর নাটক 'কন্যাদান'।

হয়ে গেল বর্ধমান স্বপ্ন অঙ্গনের নাট্যোৎসব। জোছন দস্তিদার আকাদেমির উদ্যোগে ছোটদের প্রতিভাবিকাশে 'বক্রেশ্বর উৎসব ২০১৬' অনুষ্ঠিত হলো ৪ থেকে ৬ নভেম্বর। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। আরও ছিলেন অরিন্দম গাঙ্গুলী ও খেয়ালী দস্তিদার। বিধাননগরে প্রতি বছরের মতো এবারও বসছে অলীক নাট্যমেলা। ■

শব্দরূপ-৮১৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

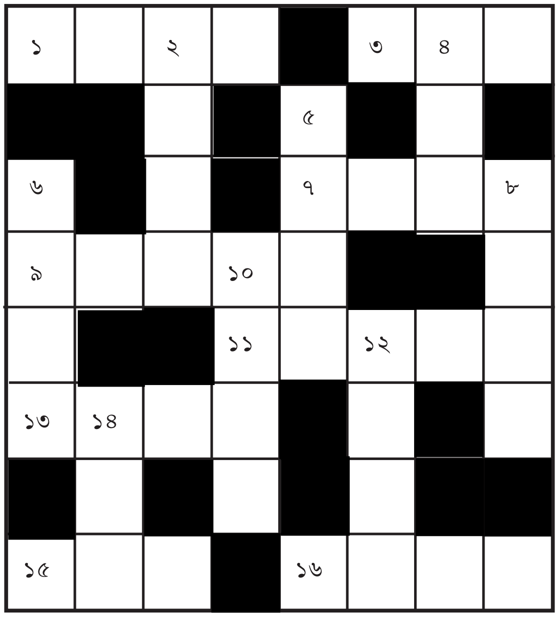

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. দুর্গা; কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা, পাণ্ডুর মাতা, ৩. জল বইবার চামড়ার থলি, ভিস্তি, ৭. অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ; যার কাছে কিছু চাইলেই পাওয়া যায়, ৯. সাদা বাংলায় 'ফাইন আর্টস্', ১১. রাসনৃত্যের জন্য চক্রাকার স্থান বা নর্তকীগণের চক্র, ১৩. জলের আধার, পুষ্করিণী, ১৫. চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি যে দৃষ্টিদোষ জন্মে, ১৬. কুরুক্ষেত্র; আধুনিক থানেশ্বর।

উপর-নীচ : ২. শিবলিঙ্গ-উপাসক সম্প্রদায় বিশেষ, ৪. পঞ্জাবের একটি নদী, ৫. গিরগিটি, বহুরূপী, ৬. ফন্দিবাজ, ধূর্ত, ৮. উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাদুর বিশেষ, ১০. হস্তগত, ১২. 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা — ', ১৪. পশুর লেজ।

সমাধান শব্দরূপ-৮১৩

প	ল	কা		বে	দ	ব্যা	স
দ্ব		ন		দ			ন
শ্রী		পা	র্থি	ব			কা
		ত		তী	র		
		লা	জ		ক্ষা		
অ			ম	ড়	ক		পা
ন্ত্য			দ		ব		ত
জ	ঠ	রা	গ্নি		চ	র	ক

সঠিক উত্তরদাতা

শঙ্কর নাথ, নালাগোলা, মালদা
গোপাল দে, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৮১৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

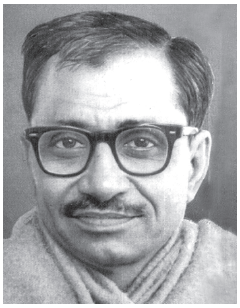

কার্লমার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ততদিনই কাজ করে যতদিন পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে দেশ সর্বহারার মহান নেতা হিসাবে প্রকাশিত না হয়। এরপর দেশ আর এই নিয়মে কাজ করতে দেয় না। এক একটি বিপ্লবকে বাধা দানের নামে দেশ নিরঙ্কুশ হয়ে যাবে এবং এমন দিন আসবে যখন নাকি রাষ্ট্রবিহীন সমাজব্যবস্থা তৈরি হবে। যা কেবল কল্পনামাত্র। বস্তুত ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও সংক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়াই হলো মার্কসবাদী দর্শনের প্রতিকূল ও প্রগতি বিরোধী কাজ। মার্কস নিজের দর্শনেরই ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই দুই অবস্থাতে মানব সমাজকে ঠিক ও সম্পূর্ণরূপে দেখা হয়নি। একদিকে মানুষকে স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, সংঘর্ষশীল ও মাৎস্যন্যায়-প্রবণ প্রাণী মনে করা হয়েছে, অন্যদিকে মানবতাকে ব্যবস্থা ও পরিস্থিতির দাস, অকিঞ্চন ও আস্থাহীন মনে করা হয়েছে। শক্তির কেন্দ্রীকরণ দুইয়ের মধ্যে অভিপ্রেত। ফলস্বরূপ দুইয়েরই পরিণাম অমানবিকতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

* * *

তিব্বতের ঘটনাবলী ও তার সম্বন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত নীতির ফলে ওই দলের অভারতীয় রূপ আর একবার প্রকট হয়েছে। তিব্বতের ভিতরে আর্থিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাই চালু থাকুক না কেন অন্য কোনো বাইরের দেশের তাকে বলপূর্বক বদল করার অধিকার নেই। যদি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিব্বতের উপর চীনা আক্রমণকে সমর্থন করে বলতে পারে যে দলাইলামার সরকার প্রতিক্রিয়াশীল, তবে তো এটাও বলতে পারে যে, ভারতের সরকার প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভারতের উপর চীনা আক্রমণ স্বাগত। এটা বিশুদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক দেশভক্ত ভারতবাসীর কর্তব্য হওয়া উচিত— কমিউনিস্টরা যেন এরূপ শক্তি অর্জন করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখা। তারা যে-কোনো দিন ভারতের স্বাধীনতা ও সুরক্ষাকে গভীর বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ১৮

‘শ্রদ্ধা’র ৮১তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

অজয় নদের বাঁকে বীরভূম জেলার বর্ধিষ্ণু ‘সিরা-নবসন’ গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তি ৮৮ বছর বয়স্ক শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ ঘোষকে ‘শ্রদ্ধার ৮১তম শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর ভদ্রাসনে নিবেদন করা হয়। ‘ওঁ’ ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পঞ্চায়েত কর্মী গোপিকা রঞ্জন ঘোষ।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাক্তার সুদীপ ভট্টাচার্য। শ্রী ঘোষ মহাশয়ের হস্তপদ ধুইয়ে, ফুল, তুলসী, চন্দন দিয়ে পূজন করেন তাঁর বড় বৌমা শ্রীমতী অনিমা ঘোষ। ‘শ্রদ্ধা’র পক্ষে মানপত্র পাঠ করেন কুবীলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা শ্রদ্ধার পরিচালন সমিতির সদস্য সুব্রত সিনহা এবং বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী তথা শ্রদ্ধার অন্যতম কর্ণধার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীঘোষকে বস্ত্র, নামাবলী, ফল, মিষ্টান্ন অর্ঘস্বরূপ প্রদান করা হয়। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন তাঁর বড়পুত্র অজিত ঘোষ, ছোটবৌমা শ্রীমতী রীতা ঘোষ। শ্রদ্ধার পক্ষে আরতি প্রদান করেন শ্রদ্ধার অনুদানী সমাজসেবিকা শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তী। তাঁকে সহযোগিতা করেন শ্রদ্ধার অনুদানী শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী তিথি ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শান্তিমন্ত্র ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

সহজ করা হলো পাসপোর্টের নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার নিয়ম আগের থেকে সহজ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বিবাহবিচ্ছিন্না মা, দত্তক নেওয়া পুত্রকন্যা এবং সাধুদের ক্ষেত্রে নিয়ম সহজ করা হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, ডিভোর্স হয়ে গেছে অথবা এখন আর একসঙ্গে থাকেন না এরকম পুরুষ ও মহিলারা পাসপোর্টের আবেদন করার সময় যদি না চান তাহলে প্রাক্তন সঙ্গী বা সঙ্গীনীর নাম এখন থেকে নাও প্রকাশ করতে পারেন। বাচ্চা থাকলে বাবা বা মা কোনো একজনের নাম অথবা বৈধ কোনো অভিভাবকের নাম দিলেই চলবে। এমনকী বিবাহবিচ্ছিন্নদের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের প্রমাণস্বরূপ সার্টিফিকেট দেখানোও আর বাধ্যতামূলক নয়। অনাথ আশ্রমে বড়ো হওয়া শিশুদের জন্মের সার্টিফিকেট জোগাড় করা যায় না বলে তাদের পাসপোর্টের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কেন্দ্রের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আশ্রমের যিনি প্রধান তিনি যদি আশ্রমের লেটারহেডে সংশ্লিষ্ট শিশুটির জন্মতারিখ জানিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করেন তা হলে সরকার তার ভিত্তিতেই পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারবে। যেসব সাধু নিয়মিত বিদেশ ভ্রমণ করেন, তাদের ক্ষেত্রেও নিয়ম সহজ করা হয়েছে। এখন থেকে সাধুরা পাসপোর্টে তাঁদের গুরুদের নাম উল্লেখ করতে পারবেন। সেই নাম সরকারি নথির অন্তর্ভুক্ত হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক।

কথা রাখেননি কেজরিওয়াল, ক্ষোভ আন্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এক সময় তারা একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। বস্তুত আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল আমআদমি পার্টির। কিন্তু গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে যে ভালোরকম চিড় ধরেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে লেখা আন্না হাজারের একটি চিঠিতে। আন্নার অভিযোগ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার যে প্রতিজ্ঞা অরবিন্দ কেজরিওয়াল করেছিলেন তা তিনি নিজেই ভঙ্গ করেছেন। আন্না লিখেছেন, 'তুমি কথা দিয়েছিলে আম আদমি পার্টির ফান্ডে যারা টাকা দেয় তাদের নাম দলের ওয়েবসাইটে থাকবে। কোনো তথ্য গোপন করা হবে না। কিন্তু জুন ২০১৬-র পর থেকে নামের তালিকাটি ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।' বৃদ্ধ নেতার খেদ, 'তুমি আমার কাছে সমাজে পরিবর্তন আনার প্রতিজ্ঞা করেছিল। দুঃখ পাই এই ভেবে যে তুমি নিজেই তোমার কথা রাখলে না।' অভিযোগের উত্তরে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কংগ্রেসকে দোষারোপ করে বলেছেন, কংগ্রেসই ভুল তথ্য দিয়ে আন্নাকে প্রভাবিত করেছে। মজার ব্যাপার হলো, ইদানীং অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রায় যে-কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার না করে জলগ্রহণ করেন না কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। যা দেখে হতবাক ওয়াকিবহাল মহল।

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১
বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭
ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২
E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

SMALL INVESTMENT TO FULFILL OUR FINANCIAL GOALS......

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
2 January - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।